যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

পাঠভবন
১২।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীমতী দীপা সান্যাল
পাঠভবন। কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রচ্ছদ : প্যানোরামা
কলিকাতা ২০

মুদ্রক : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

বিষয়

লেখকের অন্যান্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

—রবীন্দ্র পুরস্কার সম্মানিত

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

বিদ্রোহী ডিরোজিও

সূতানুটি সমাচার

কলকাতা কালচার

জনসভার সাহিত্য

কালপেঁচার নকশা

কালপেঁচার দু'কলম

কালপেঁচার বৈঠকে

টাউন কলিকাতার কড়চা

যুবকল্যাণ

কালপেঁচার রচনাসংগ্রহ

পাঠ্যবই

সমাজবিদ্যা

সমাজবিদ্যা প্রবেশিকা

ভারতজনের ইতিহাস

আমি যখন বিদ্যাসাগর-জীবনী লিখছিলাম এবং তা ধারাবাহিক-ভাবে কোন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল, তখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয় (১৯৫৭)। সেই উপলক্ষে সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগর-স্মৃতি বক্তৃতামালার উদ্‌বোধন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে বক্তৃতাগুলি দিতে অনুরোধ করেন। পর-পর দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা আমাকে দিতে হয়। আমার লেখা 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামে বিদ্যাসাগরের বড় চরিতগ্রন্থের (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) 'প্রথম খণ্ডে' এই বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। পরে ভারতসরকারের প্রকাশন-বিভাগ থেকে আমার লেখা বিদ্যা-সাগরের একটি ইংরেজী জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাব্রতী, শিক্ষার্থী ও পাঠকগোষ্ঠীর কাছ থেকে গত কয়েক বছর ধরে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী একখানি বিদ্যা-সাগর-জীবনী লেখার ক্রমাগত তাগিদ এসেছে। অবকাশের অভাবে এই কাজটি এতদিন করতে পারিনি। যাঁদের তাগিদে এই কাজটি করা হল তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

প্রথমে যখন বিদ্যাসাগর-জীবনী লিখতে আরম্ভ করে-ছিলাম—'মাসিক বসুমতী'-তে—তখন তার নাম দিয়েছিলাম 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর'। সেই নামটি এখন এই কিশোরপাঠ্য বিদ্যাসাগর-জীবনীর জন্য ব্যবহার করতে পেরে খুশি হয়েছি। কিশোরসাহিত্যের তথাকথিত 'অতিসারল্য' আমার কাছে 'দোষ' বলে মনে হয়। যাঁরা এটাকে 'গুণ' বলে মনে করেন তাঁদের ধারণা কিশোরদের বোধশক্তি ও বুদ্ধি অত্যন্ত কম, কাজেই খুব তরল করে অকারণে ফেনিয়ে কিছু না বললে তারা বুঝতে পারে না। এ ধারণা, আমার মনে হয়, ভুল। সহজ করে বলা, আর

তরল করে ফেনিয়ে বলা, এক জিনিস নয়। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয় এখানে আমি সহজ করে বলবার চেষ্টা করেছি, এবং কোন বিষয়—তা যত জটিলই হোক না কেন—বাদ দিইনি। তার কারণ, আমার মনে হয়, জটিল বিষয় নিয়েও আজকের দিনে কিশোরদের চিন্তা করতে শেখা উচিত। 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে গল্প' (১২ অধ্যায়) অনেক সংগ্রহ করে দিয়েছি। গল্পগুলির ভিতর দিয়ে বিদ্যাসাগরচরিত্রের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংকটকালে বিদ্যা-সাগরের মতো যুগপুরুষদেব জীবনী বাংলার কিশোর ছেলে-মেয়েদের বারংবার পড়া উচিত, কারণ এরকম জীবনচরিত জাতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রেরণার অফুরন্ত আকর।

বিনয় ঘোষ
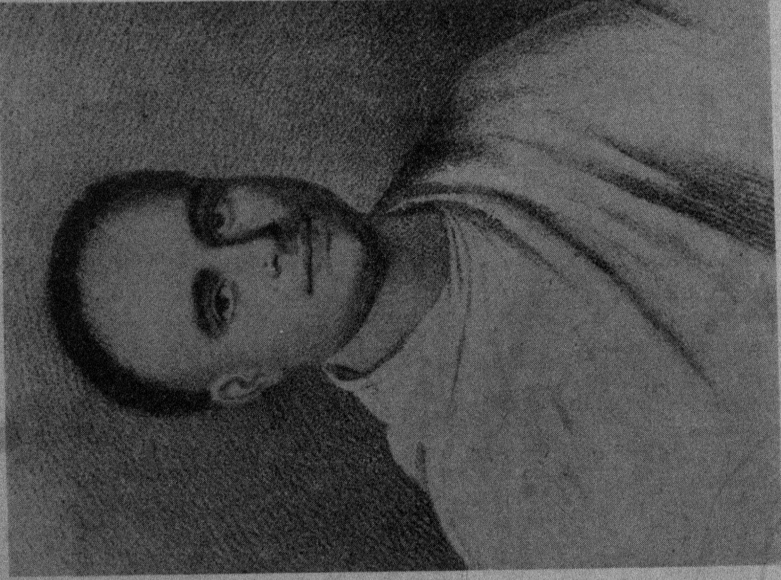
তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগর—১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বীরসিংহের পুরুষসিংহ

বাংলার এক পুরুষসিংহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

তখন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। একটি যুগ অস্ত যাচ্ছে, আর একটি নতুন যুগের উদয় হচ্ছে। অস্তগামী যুগ মুসলমান বাদশাহী আমল, উদীয়মান যুগ ব্রিটিশ আমল। নতুন যুগে আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে ও মানুষের মনে নানাদিক থেকে একটা সাড়া জেগেছিল। অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার আদর্শে বাংলাদেশের কয়েকজন সুসন্তান অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই ব্রাহ্মণসন্তান এবং 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশজাত। রামমোহনের জন্ম সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘরে, বিদ্যাসাগরের জন্ম দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রামমোহন, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যাসাগর। রামমোহনের জন্ম ১৭৭৪ সালে, বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে। সেকালের হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে দুজনেরই জন্ম। তখন আরামবাগ ছিল পরগণা জাহানাবাদ ও সরকার মদারনের (মন্দারণ) মধ্যে। তারপর জেলা ও পরগণার সীমারেখার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। এখন রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর গ্রাম হুগলি জেলার দক্ষিণ-আরামবাগে, বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায়।

বনমালিপুর বীরসিংহ পাতুল গোঘাট—এই চারটি গ্রাম বিদ্যাসাগর-পরিবারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। বনমালিপুর বিদ্যাসাগরের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান, বীরসিংহ বিদ্যাসাগরের পিতার মাতুলালয়, পাতুল বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়, গোঘাট বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয়। বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের পিতামহ বসতি স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ও পিতামহের কালে এই চারটি গ্রামেই বিখ্যাত পণ্ডিতদের বাস ছিল। তাঁদের বংশ ও বিদ্যার গৌরবের কথা সকলেই জানতেন। বিদ্যা ও তেজস্বিতার এই পারিবারিক গৌরবের ধারা বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের জীবনেও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

পুত্রকে গর্ভে ধারণ করার সময় বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী-দেবী নানারকম রোগে ভুগে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের লোকের ধারণা হয়েছিল যে ভূতপ্রেত কিছু ভগবতী দেবীকে ভর করেছে। সেকালের লোকের পক্ষে এরকম ভাবা স্বাভাবিক। কাজেই ভগবতী দেবীর ভূত নামা-বার জন্য ওঝাদের ডাকা হল। ওঝারা ঝাড়-ফুঁক অনেক করল, কিন্তু ভূত কিছুতেই নামল না। বীরসিংহের কাছে উদয়গঞ্জ গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি বাস করতেন। অবশেষে রোগ ধরার জন্য তাঁকেও ডাকা হল। তিনি এলেন এবং কোষ্ঠী দেখে বললেন যে রোগ বা ভূতপ্রেত কিছুই নেই, মাতৃগর্ভে এক মহাপুরুষ আছেন, তাঁরই দিব্য-জ্যোতির প্রকাশ হচ্ছে।

শুধু বিদ্যাসাগরের নয়, সমাজের অসাধারণ পুরুষ যাঁরা,

তাঁদের জন্ম ও বাল্যকাল সম্বন্ধে এরকম অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তখন তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনিও নাকি কেদার পাহাড়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর বংশে এক মহাশক্তিশালী পুরুষের জন্ম হবে। অবশেষে বাংলা ১২২৭ সনের ১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার (ইংরেজী ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০), বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবতী দেবীর গর্ভ থেকে যিনি ভূমিষ্ঠ হলেন, তিনি ভূতপ্রেতও নন দিব্যজ্যোতি মহাপুরুষও নন, অতিদরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি শীর্ণকায় পুত্রসন্তান—ঈশ্বরচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্রের যখন জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস গৃহে ছিলেন না, হাটে গিয়েছিলেন। পিতামহ রামজয় পুত্রকে নাতির জন্মসংবাদ দেওয়ার জন্য হাটের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথে দেখা হতে তিনি বললেন 'আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে'। বাড়িতে একটি গাইগরু গর্ভিণী ছিল, ঠাকুরদাস ভাবলেন বোধহয় সেই গরুটারই একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে। বাড়িতে পৌঁছে গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় রামজয় তাঁকে ডেকে বললেন 'ওদিকে নয়, এদিকে এসো'। তারপর আতুড়ঘরের দিকে নিয়ে গিয়ে নবজাত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন 'এই আমাদের এঁড়ে বাছুর'।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর ছোট একটি 'আত্মচরিত' লেখেন। তাতে শুধু তাঁর বাল্যজীবনের কথা আছে। এই কাহিনীর উল্লেখ করে আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন :

"এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের

পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন—'ইনি সেই এঁড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।' জন্ম সময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল ; আর সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

পিতামহ রামজয়ের কথা বিদ্যাসাগরের জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। বাস্তবিক এঁড়ে গরুর একগুঁয়েমিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন কাজে যখন তিনি বাধা পেতেন তখন সেই কাজ করার জন্য তাঁর জিদ আরও বাড়ত, ধুতি-চাদর-চটি পরা সাদাসিধে ব্রাহ্মণ বাঙালীর মূর্তিটি বজ্রের মতো কঠোর হয়ে উঠত। শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় বিদ্যাসাগর যত বাধা পেয়েছেন, তত তাঁর সংকল্প কঠিন হয়েছে। পিতামহের 'এঁড়ে বাছুর' পরিহাস তাঁর জীবনে বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে।

২

রাখাল বালক

বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণ-পরিচয়' প্রথম ভাগে গোপাল ও রাখাল নামে দুটি বালকের গল্প আছে। আজকাল বাঙালীর ছেলেরা বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়' পড়ে না, রঙচঙে বাহারে বই দেখে বর্ণ পরিচয় করে। গোপাল ও রাখালের গল্প তারা অনেকেই জানে না, কিন্তু আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেও বর্ণ পরিচয় হয়েছে এরকম প্রত্যেক বাঙালী ছেলেমেয়ে গল্পদুটি জানত। পিতা মাতা দুষ্টু ছেলে যে তাকে বলতেন রাখাল, আর শান্তশিষ্ট যে তাকে বলতেন গোপাল। বিদ্যাসাগর নিজে বলেছেন, গোপাল বড় সুবোধ ছেলে। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব ভাল পরব বলে উৎপাত করে না। গোপাল যখন পড়তে যায়, পথে খেলা করে না। সকলের আগে পাঠশালায় যায়, নিজের জায়গায় চুপ করে বসে, বই খুলে পড়তে থাকে এবং গুরুমশায় যা বলেন মন দিয়ে শোনে। এই হল গোপাল।

গোপালের ঠিক বিপরীত হল রাখাল, যেমন দুষ্টু তেমনি অবাধ্য। লেখাপড়া করে না, কেবল সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে। রাখালকে কেউ ভালবাসে না। বিদ্যাসাগর বলেছেন "কোন বালকেরই রাখালের মতো হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মতো হইবে সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।" বিদ্যাসাগরের চিন্তা হল লেখাপড়া শেখা, তাই তিনি গোপা-লের প্রশংসা করেছেন, যদিও ছেলেবেলায় তিনি রাখালের

মতো ছিলেন এবং তা সত্ত্বেও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখে মহাপণ্ডিত হয়ে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশে গোপালের অভাব নেই। শুধু গোপাল নয়, আমাদের দেশ নাড়ুগোপালের দেশ। এদেশের লোকের ধারণা, ঘরে বসে হাত ঘুরোলেই নাড়ু পাওয়া যায়, নইলে নাড়ু পাওয়া যায় না। গোপাল ও নাড়ুগোপাল পথে-ঘাটে অনেক দেখা যায়। স্কুল-কলেজের গোপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাল, কর্মক্ষেত্রের গোপাল, সংসারের গোপাল, নানাশ্রেণীর গোপাল আছে দেশে। অবশ্য আজকাল রাখালেরও অভাব নেই। কিন্তু তবু ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, যে-কোন দেশের সমাজে গোপালের মতো ছেলেদের যা দাম, তার চেয়ে অনেক বেশি দাম রাখালের মতো ছেলেদের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যা-সাগরচরিত' রচনায় খুব সুন্দর করে এই কথাটি লিখেছেন। তিনি বলেছেন, এই ক্ষীণতেজ বাংলাদেশে রাখাল ও তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হলে বাঙালীজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচে যেতে পারে। সুবোধ ছেলেরা পাস করে ভাল চাকরিবাকরি পায়, বিবাহকালে প্রচুর বরপণ পায়, কিন্তু অবাধ্য অশান্ত ছেলেদের কাছ থেকে স্বদেশের জন্য অনেক কিছু আশা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন"। আমরা বলতে পারি, তার বহুকাল পরে বীরসিংহের ভগবতী দেবীর আর এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা আবার নতুন করে পূর্ণ করেন। নবদ্বীপের নিমাই, আর বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্র, বাংলার ইতিহাসের দুই যুগসন্ধিক্ষণের দুই আদর্শ যুগপুরুষ।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মতো সুবোধ ছিলেন না,

অনেকটা রাখালের মতো দুরন্ত ছিলেন। অবশ্য লেখাপড়ায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এই একটি বিষয়ে ছাড়া সুবোধ গোপালের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের বিশেষ আর কোন মিল ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পাঠশালায় ভর্তি হন। সনাতন সরকার নামে এক গুরুমশায়ের পাঠশালা। পাততাড়ি বগলে করে তিনি রোজ পাঠশালায় যাতায়াত করতেন। সেকালের গুরুমশায়দের মতো সনাতন ছাত্রদের প্রহার করতে খুব পটু ছিলেন। দুরন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের পিঠে প্রায়ই সনাতনের বেতের দাগ দেখা যেত। ঠাকুরদাস ভয় পেয়ে কালীকান্ত নামে অন্য একজন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ছেলেকে পাঠালেন। 'বর্ণ পরিচয়ে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন ঃ "গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না, সকলের আগে পাঠশালায় যায়"। বিদ্যা-সাগর নিজে তা কখনই যেতেন না। পাঠশালায় যাতায়াতের পথে তিনি প্রতিবেশীদের নানাভাবে উপদ্রব করতেন। যারা শুচিবায়ুগ্রস্ত তাদের দরজার সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলে দিতেন, যাতে দরজা খুলেই তারা তেলেবেগুনে চটে ওঠে। প্রতিবেশীরা ভয় দেখালে তিনি আদৌ গ্রাহ্য করতেন না, বরং তাদের বিরক্ত করার জন্য তাঁর আরও জিদ্ বাড়ত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবেশীদের যেভাবে জ্বালাতন করতেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বর্ণ পরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখন করে নাই"।

গ্রামবাসীরা নয় শুধু, বেচারা গাছপালাও মুখ বুজে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উপদ্রব সহ্য করত। পাঠশালার পথে পাকা ধানের ছড়া, যবের ছড়া, আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা ইত্যাদি যাবতীয় ফলমূল যা পাওয়া যেত সব তিনি খেতে খেতে যেতেন। কখন যে পাঠশালায় পৌঁছতেন তার ঠিক থাকত না। একবার ধানের

মুণ্ডা আটকে প্রাণ প্রায় কণ্ঠাগত হয়েছিল। পিতামহী চিৎ করে কোলে ফেলে অনেক কষ্টে সেই মুণ্ডা বার করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এমনি ছিল তাঁর দুরন্তপনা। 'বর্ণপরিচয়ে'র রাখালের গুরু হবার যোগ্য। বীরসিংহ গ্রামে অতিবৃদ্ধ আম জাম কাঁঠাল তাল নারকেল গাছ অনেক আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের দুরন্তপনার নির্বাক সাক্ষী তারা। যদি তারা কথা বলতে পারত, তাহলে তাদের কাছ থেকে বিদ্যাসাগরের ছেলে-বেলার স্মৃতিকথা অনেক শোনা যেত। বীরসিংহের মাটিতে, মাঠে-ঘাটে, গাছের ডালে ডালে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পায়ের চিহ্ন আঁকা রয়েছে মনে হয় এবং সমস্ত গ্রাম ও তার চারিদিক জুড়ে তাঁর দৌরাত্ম্যের পদধ্বনি আজও যেন শোনা যায়।

মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম দরিদ্র মেহনতী মানুষের গ্রাম। রাজা-মহারাজা বা জমিদারের প্রাসাদের কোন ভগ্নস্তূপ নেই বীরসিংহ গ্রামে। 'বাঁকুড়া রায়' ধর্মঠাকুর ও শীতলানন্দ শিবের প্রাচীন মন্দির আছে। আর আছে গ্রামবাসীদের মাটির ঘর, ঈশ্বরচন্দ্রের পৈতৃক ভিটে এবং তার পাশে তাঁর বংশের উত্তর-পুরুষদের মাটির ঘর। এই মাটির ঘরেই ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন এবং মাটির ঘরেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা প্রধানত সেই শ্রেণীর মানুষ, মাটির সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ যাঁদের প্রত্যক্ষ ও গভীর। তারা কৃষক, তারা জেলে, তারা বাগ্‌দী। বীরসিংহে তাদেরই বাস বেশি, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বাস বেশি নয়। অধিকাংশ গ্রামবাসী দরিদ্র হলেও মাটির মানুষ এবং খাঁটি মানুষ। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় মাটির কাছাকাছি এই খাঁটি মানুষগুলির মধ্যে

মানুষ হয়েছিলেন। চাষী জেলে বাগ্‌দীর ছেলেরা ছেলেবেলায় তাঁর খেলার সঙ্গী ও দৌরাত্ম্যের সহচর ছিল। তাঁর চরিত্রে তাই কৃত্রিমতার কোন চিহ্ন ছিল না। সহজ সরল ও বলিষ্ঠ মানুষ হয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন।

ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ ও ঠাকুরমা দুর্গা দেবীকে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকজনদের অনেক নালিশের নিষ্পত্তি করতে হত প্রতিদিন। তাতে কেউ খুশি হত, কেউ হত না। গ্রামবৃদ্ধরা ঈশ্বরচন্দ্রের বালকসুলভ চাপল্য ধৈর্য ধরে সহ্য করতে বলতেন। বোধহয় তাঁর চাপল্যের মধ্যে তাঁরা শক্তির প্রাচুর্যের আভাস পেয়ে মনে মনে ভাবতেন, বালক ঈশ্বরচন্দ্র ভবিষ্যতে একদিন মানুষের মতো মানুষ হবেন। সারাদিনের দুষ্টুমির পর যখন সন্ধ্যা হত তখন দুর্গা দেবী নাতিকে ডেকে বলতেন, পড়তে বস। মাটির প্রদীপ জ্বেলে ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসতেন। ক্লান্তিতে তাঁর ঘুম আসত। কি পড়বেন ? ছেলেদের পড়বার মতো ছাপা বই তখন ছিল না। বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, এই সব তখনও লেখা হয়নি। যিনি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য এই বইগুলি লিখে শিশু-শিক্ষার একটি বড় অভাব দূর করবেন, তিনিই পিতামহীর আদেশে প্রদীপের সামনে পড়তে বসতেন। কিন্তু কি পড়বেন ?

লেখাপড়ার লেখাটাই ছিল তখন আসল, পড়াটা ছিল নকল। অর্থাৎ পড়াটা ছিল আবৃত্তি, হাতে-লেখা পুঁথির পাঠ অভ্যাস। অক্ষরের উপর দাগা বুলিয়ে লেখা অভ্যাস করতে হত, আর আবৃত্তি করে মুখস্থ করতে হত পুঁথির পাঠ। প্রথমে তালপাতায় লেখা আরম্ভ করতে হত, তারপর লেখার উন্নতি হলে কলাপাতায় লিখতে হত। ছোট একটি বসবার আসনে

তালপাতা জড়িয়ে নিয়ে যেতে হত গুরুমশায়ের পাঠশালায়। এই জড়ানো পুঁটলিটাকে বলা হত 'পাততাড়ি'। বাড়িতেই হোক আর পাঠশালাতেই হোক, পাততাড়ি বগলে করে পড়তে বসতে হত।

তখন ছেলেদের মাথায় বড় বড় চুল রাখার রীতি ছিল। কিশোর ও যুবক ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মতো দীর্ঘকেশ থাকত। ছেলেরা অনেক বয়স পর্যন্ত হাতে রুপোর বালা পরত। ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার কোন ছবি নেই। থাকলে হয়তো দেখা যেত, তখনকার সামাজিক রীতি অনুযায়ী তাঁর মাথাতেও বড় বড় চুল ছিল এবং পিতামহী দুর্গা দেবী সেই চুল চুড়ো করে ঝুঁটি বেঁধে দিতেন। কোন কোন ছেলের মাথায় ঝুঁটিতে রুপোর বকুলফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হত এবং হাতে থাকত রুপোর বালা। সেকালের প্রায় সকল স্তরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের এই ছিল বাল্যকালের বেশ। রামজয় ও দুর্গা দেবী তাঁদের আদরের জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে এছাড়া যে অন্য কোন বেশে সাজিয়ে দিতেন তা মনে হয় না। এই বেশে বালক ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্তের পাঠশালায় পড়তে যেতেন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কপাটি খেলতেন, ডাণ্ডাগুলি খেলতেন, কুস্তি করতেন। গ্রামের বালকদের কাছে এইসব খেলাই তখন খুব প্রিয় খেলা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এইসব খেলা খেলতে ভাল-বাসতেন। ভয়ডর বলে বিশেষ কিছু তাঁর ছিল না। গ্রামে তখন চোরডাকাতের ও ভূতপ্রেতের ভয় যথেষ্ট ছিল। জীবন্ত বা মৃত কোন ভূতের ভয়ই তাঁকে বিচলিত করত না।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ একা-একা দিনে-রাতে যখন ইচ্ছা গ্রামের বনজঙ্গলের পথে চলতেন। এটা তাঁর অভ্যাস ছিল। পথের দূরত্ব, অথবা বিপদ-আপদ কিছুই তিনি

তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কাউকে সঙ্গে নিয়েও পথ চলতেন না। সঙ্গী বলতে হাতে শুধু একটি পাকা বাঁশের লাঠি থাকত। এই লাঠি দিয়ে তিনি পথে চোর-ডাকাত নয় শুধু, বুনো ভাল্লুকও জখম করেছেন। এদিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন পিতামহ রামজয়ের সুযোগ্য পৌত্র। দরিদ্র রামজয় তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় নাতিটিকে কোন ধনদৌলত কিছু দিয়ে যেতে পারেননি বটে, শুধু তাঁর চরিত্রের দুর্জয় পৌরুষের মহৎ গুণটি উজাড় করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল এই দুর্জয় পৌরুষ।

৩

গ্রাম থেকে শহরে

নবযুগের নতুন শহর কলকাতা। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালে (১৮২০-২৮ খ্রীষ্টাব্দে) কলকাতা দ্রুত নাগরিক রূপ ধারণ করছিল। নতুন জীবনযাত্রার, নতুন কাজকর্মের, নতুন শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল কলকাতা শহর বাংলাদেশে। গুরুমশায় কালীকান্ত তাই একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাসকে বললেন, 'আমার পাঠশালায় ঈশ্বরের যা শিক্ষা করা আবশ্যক তা শেষ হয়েছে। আমার মনে হয় এখন তাঁকে কলকাতা শহরে নিয়ে গিয়ে ইংরেজীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ভাল। টোল-চতুষ্পাঠীর যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ সংস্কৃত-বিদ্যার কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিদ্যার বাস্তব ফলাফল সম্বন্ধে গ্রাম্য গুরুমশায় কালীকান্তেব জ্ঞান বেশ প্রখর ছিল। তিনি ঠাকুরদাসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'—একথা সংস্কৃত পণ্ডিতদের জন্য সত্য নয়, একালের ইংরেজীশিক্ষিতদের জন্য সত্য। ঠাকুরদাসও একথা জানতেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন: "তদনুসারে ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম।" ইংরেজী ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ থেকে কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন।

পাঁজিপুথি দেখে কলকাতা যাত্রার শুভ দিনক্ষণ স্থির হল। বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে যাত্রা করা তখন দূর দেশান্তর যাত্রা করার মতো ব্যাপার ছিল। তখন রেলপথ

হয়নি, কোন বাষ্পীয় যানবাহনের শব্দ শোনা যায়নি বাংলা-দেশে। চলার পথ ছিল একমাত্র হাঁটাপথ অথবা নদীপথ। বীরসিংহ থেকে ঘাটাল এসে, নদীপথে নৌকায় রূপনারায়ণ দিয়ে গঙ্গায় পড়ে কলকাতার ঘাটে এসে ওঠা যেত। কিন্তু নদীপথে তখন বিপদ-আপদের ভয় ছিল। নৌকাডুবির ভয় নয়, ডাকাতের হাতে লুঠ-পাটের ভয়, প্রাণহানির ভয়। যাত্রীরা তাই নদীপথে দল বেঁধে, একাধিক নৌকার বহব নিয়ে যাত্রা করতেন। যাত্রা বলতে তখন প্রধানত বাণিজ্যযাত্রা অথবা তীর্থ-যাত্রা বোঝাত। তীর্থযাত্রা যাঁরা করতেন তাঁরা ইহলোক থেকে পরলোকে যাত্রা করছেন, এই কথা মনে করেই বাড়ি থেকে বেরুতেন। বাণিজ্যযাত্রা যাঁরা করতেন তাঁদের সঙ্গে রক্ষীদল থাকত। ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের আস্তানাগুলোও তাঁদেব জানা থাকত। কি কৌশলে তাদের হাতে রাখতে হয় তাও তাঁরা জানতেন, হয় ভেট দিতেন, না হয় রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ঠ্যাঙাড়েদের আস্তানাব দিকে নৌকা ভেড়াতেন না। এই-ভাবে সেকালেব সদাগবরা বহুদিনেব জন্য নদীপথে বাণিজ্য যাত্রা করতেন।

সাধারণ মানুষ হাঁটাপথেই বেশি যাতায়াত করত। হাঁটা-পথও ছিল দুর্গম। বীরসিংহ থেকে বেরিয়ে, ঘাটাল হয়ে, আরামবাগের ভিতর দিয়ে, পুরাতন বারানসীর পথ ধরে, চাঁপাডাঙ্গা-শিয়াখালার উপর দিয়ে হাওড়ার সালখের ঘাট পর্যন্ত পথ। পথের উপর নদীনালার অন্ত নেই। শিলাই, দ্বার-কেশ্বর, কানাদ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর সব পার হয়ে, অবশেষে গঙ্গার উপর দিয়ে নতুন শহর কলকাতায় পৌঁছতে হত। চলার পথে আশ্রয়স্থল ছিল আত্মীয়স্বজনের বাড়ি অথবা চটি বা সরাইখানা। আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে হাঁটিয়ে

নিয়ে যেতে হবে প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। পথে বিশ্রামের স্থান ভাল থাকা দরকার। ঠাকুরদাসের মনে হল পাতুলগ্রামে তাঁর মামাশ্বশুরের বাড়ি, সন্ধিপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি, আর একটু উত্তরে তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে এক বোনের বাড়ি। সুতরাং পথে আশ্রয় ও বিশ্রামের অসুবিধা হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই হাঁটাপথেই কলকাতা যাওয়া স্থির হল।

যাত্রার শুভদিনে ভোরবেলা ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যসঙ্গীরা এসে ভিড় করে দাঁড়াল। কলকাতা শহরে কেউ যাচ্ছে, একথা ভাবতে গ্রামের লোকের তখন রোমাঞ্চ হত। সঙ্গীরা অবাক হয়ে ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। জননী ভগবতী দেবী ও পিতামহী দুর্গা দেবী চোখের জলে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি শেষ করলেন। পুরাতন গ্রাম ছেড়ে নতুন মহানগরের পথে যাত্রা শুরু হল। নতুন জীবনের পথে যাত্রা। সহযাত্রী হলেন পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমশায় কালীকান্ত, ভৃত্য আনন্দরাম। দীর্ঘ পথ চলতে যদি আট বছরের বালকের ক্লান্তি আসে, যদি তার ছোট ছোট পায়ে পথের কাঁটা বেঁধে, তাহলে আনন্দরাম তাকে স্বচ্ছন্দে কাঁধে করে, দরকার হলে দৌড়েই কলকাতায় চলে যেতে পারবে। আনন্দরাম তাই সঙ্গে রইল।

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চললেন মহা-নগরীর দিকে। পথের সঙ্গী তিন জন। জীবনে এরকম আরও কত দুর্গম ভয়াবহ পথ তাঁকে চলতে হবে! তখন পিতা, গুরু-মশায় বা আনন্দরামের মতো সঙ্গীও কেউ থাকবে না। অনেক পথ জীবনে হয়ত একাই চলতে হবে, সঙ্গী হবে সাহস ও সংকল্প। একথা বালক বিদ্যাসাগরের মনের আকাশে, পথ চলতে চলতে, একবারও কি বিদ্যুতের মতো ঝলকে ওঠেনি!

পথের উপর খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে পাতুলগ্রাম,

জননীর মাতুলালয়। পাতুলে একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সন্ধ্যার সময় অন্যগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি ঠাকুরদাস তাঁর পুত্র ও সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে তারপরদিন শিয়াখালার সালখের বাঁধা রাস্তা দিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। বাঁধা পথে এক মাইল অন্তর পাথরের মাইল-স্টোন পোঁতা থাকে। গ্রামের মেঠো পথে এ দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র দেখেননি। স্বভাবতই তাঁর মনে কৌতূহল হল, পথের ধারে এই বস্তুগুলি কি ? পিতাপুত্রে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল ঃ

পুত্র। রাস্তার ধারে বাটনাবাটা শিল পোঁতা আছে কেন বাবা ?

পিতা। বাটনাবাটা শিল নয় বাবা, এগুলোকে বলে 'মাইলস্টোন'।

পুত্র। সেটা আবার কি ? দেখতে তো ঠিক শিলের মতো।

পিতা। 'মাইলস্টোন' ইংরেজী কথা। দু'মাইলে এক ক্রোশ, এক মাইলে আধ ক্রোশ। 'স্টোন' কথার মানে পাথর। এক মাইল অন্তর এরকম এক-একটি পাথর পুঁতে দিয়ে পথের দূরত্ব জানানো হয় বলে এর নাম 'মাইলস্টোন'।

পুত্র। এর ওপর এক, দুই, তিন সব লেখা থাকে বুঝি ?

পিতা। হ্যাঁ, লেখা থাকে। সামনের এই পাথরটার গায়ে ইংরেজীতে লেখা আছে 'উনিশ'। অর্থাৎ বাঁধা পথে আরও উনিশ মাইল পথ আমাদের চলতে হবে।

পুত্র। একের পিঠে নয় উনিশ ?

পিতা। হ্যাঁ।

পুত্র। (অক্ষরের গায়ে হাত বুলিয়ে) তাহলে এই অক্ষরটা

ইংরেজীর 'এক', আর এর পিঠের অক্ষরটা ইংরেজীর 'নয়' ?

পিতা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।

পুত্র। তাহলে এরপর আঠারো, সতেরো, ষোলো এই-ভাবে 'এক' পর্যন্ত লেখা পাথর দেখতে পাব তো ?

পিতা। হ্যাঁ, পাবে, তবে যে পাথরটায় 'এক' লেখা থাকবে সেখান দিয়ে আমরা আজ যাব না। 'দুই' পর্যন্ত যাব, তারপর বেঁকে গিয়ে অন্য পথ ধরে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছব। যদি সেটা দেখতে চাও অন্য একদিন দেখাব।

পুত্র। 'এক' তো দেখেছি, ওটা আর দেখার দরকার কি ? 'নয়' থেকে 'দুই' পর্যন্ত দেখলেই ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর সব চেনা হয়ে যাবে।

গুরুমশায় কালীকান্ত উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলি শুনলেন। শিয়াখালা-সালখের বাঁধা রাস্তায়, কোন গুরুর সাহায্য না নিয়েই, ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল।

এইবার পরীক্ষার পালা। 'দশ' মাইলের পর যখন 'নয়', 'আট' 'সাত' অক্ষরগুলি আরম্ভ হল তখন 'ছয়' মাইলের অক্ষরটি ইচ্ছা করে বাদ দিয়ে, পাঁচ মাইলের অক্ষরটি ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি অক্ষর বল তো ?' 'ছয়' নম্বর পাথরটি তাঁর চোখের আড়াল দিয়ে কখন চলে গেছে তা তিনি জানতেন না। তাই 'পাঁচ' অক্ষরটি দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'এটা তো ছয় হবার কথা, ভুল করে পাঁচ লিখেছে কেন ?' ঠাকুরদাসের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র পাস করলেন। ঠাকুরদাস খুশি হলেন, গুরুমশায়ও খুশি হলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর আত্মচরিতে লিখেছেন ঃ

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের পৈতৃক বাড়ির একাংশ
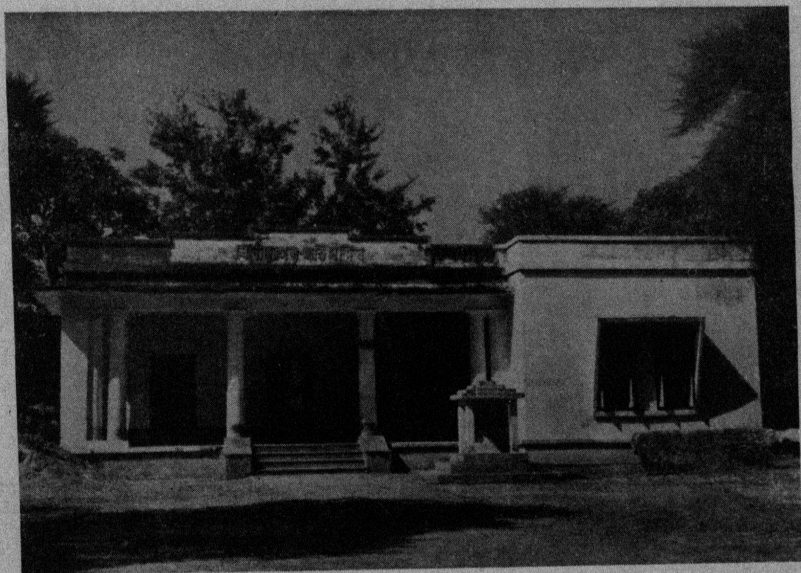
বীরসিংহ গ্রামে পৈতৃক বাস্তুভিটায় বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন
এইখানে বিদ্যাসাগর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন

"এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন ; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া, 'বেশ বাবা বেশ' এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।"

কেবল যে ঠাকুরদাস আর কালীকান্তের আনন্দ হয়েছিল তা নয়, ভৃত্য আনন্দরামের আনন্দ বোধহয় সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

উনিশ নম্বর মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম প্রশ্ন করেন, পাঁচ নম্বর মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি পরীক্ষায় পাস করেন। বোঝা যায়, সালখের রাস্তায় চৌদ্দ মাইল পথ হাটার পর তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আট বছরের বালকের পক্ষে একটানা চোদ্দ মাইল পথ হাঁটা সহজ নয়। নিশ্চয় ক্লান্তিতে ঈশ্বরচন্দ্রের দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তবু পথ চলার তাঁর বিরাম ছিল না। ইচ্ছা করলে এই সময় পিতা বা গুরুমশায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র রাজপুত্র রোহিতের পথ চলার গল্পটি বলতে পারতেন। দীর্ঘদিন পথ চলে চলে রাজপুত্র রোহিত শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরমুখো যাচ্ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণবেশে দেবতা ইন্দ্র তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন ঃ

'হে রোহিত! চলতে চলতে যে শ্রান্ত হয় তার শ্রীর অন্ত নেই। যে চলে, দেবতা ইন্দ্র সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ হলেও ক্রমে সে

নীচ হতে থাকে। অতএব চরৈবেতি, চরৈবেতি— এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।'

'হে রোহিত! যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায় তাঁর ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

বীরসিংহ থেকে কলকাতার পথে চলতে চলতে নবযুগের রেহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কানে ইন্দ্রের এই কথাগুলি বহুযুগের ওপার হতে ভেসে এসেছিল—

'যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে, অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

৪

কলকাতা শহর

সালখের বাঁধাপথ শেষ হল গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঘাটের ধারে। পূর্ব তীরে ভোরের সূর্যের মতো কলকাতা শহর বালক ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের সামনে ভেসে উঠল। পথ চলার প্রথম পর্ব শেষ হল। খেয়ানৌকা কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ল। পাল্‌কি-বেয়ারারা ঘিরে ধরল নবাগতদের। কিন্তু চেহারা দেখে তারা হতাশ হয়ে গেল। একেবারে গেঁয়ো লোক, শৌখিন বাবুও নয়, সাহেব-মেমও নয়। পাল্‌কিতে চড়ে যাবার লোকও নয় এরা। ঠাকুরদাসের কাছে কলকাতা শহর একেবারে অচেনাও নয়। দশ-পনের বছর আগে কলকাতা শহরে তিনি এসেছেন, যে জন্য গ্রাম থেকে অনেকে শহরে আসে, অর্থাৎ চাকরির সন্ধানে। বড়বাজারে দয়েহাটা অঞ্চলে ভাগবতচরণ সিংহ নামে একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন কায়স্থের পরিবারে তিনি থাকতেন। সিংহমশায় তাঁর পিতা রামজয় তর্কভূষণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বড়বাজারে তখন আজকের মতো অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল না, শেঠ বসাক মল্লিক প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল। সিংহ পরিবারের সহৃদয় ব্যবহারে ঠাকুরদাস মুগ্ধ হয়েছিলেন। অতএব পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে তিনি বড়বাজারে সিংহমশায়ের বাড়িতে এসে উঠলেন। এর মধ্যে ভাগবতচরণের মৃত্যু হয়েছে, এবং তাঁর পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের সর্বময় কর্তা হয়েছেন।

জগদ্দুর্লভের বয়স তখন পঁচিশ বছর। পরিবারও তাঁর বেশ বড়। এই পরিবারে তাঁর এক বিধবা ছোট বোন ও তাঁর

এক পুত্রও থাকত। এই বিধবা বোনটির নাম রাইমণি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে 'ছোড়দিদি' বলতেন। রাইমণির একমাত্র পুত্র গোপাল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়সী। ঈশ্বরকে তিনি পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। রাইমণির স্নেহের স্পর্শে বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছেদের বেদনা প্রায় একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। এই রাইমণির স্নেহের কথা ঈশ্ববচন্দ্র জীবনে কোনদিন ভুলতে পারেন নি। অনেক পরিণত বয়সে তিনি যে আত্মচরিত লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাতে রাইমণির কথা এমন গভীর আবেগের সঙ্গে লিখে গিয়েছেন যে তাঁর নিজের ভাষাতেই এখানে তা প্রকাশ না করে পারা যায় না। তিনি লিখেছেন ঃ

"…রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য-মূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবী মূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয়, সে

নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।”

বিদ্যাসাগরের এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, বাল-বিধবা রাইমণির প্রভাব ছেলেবেলায় তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যিনি প্রৌঢ়বয়সে রাইমণির কথা এমনভাবে স্মরণ করতে পারেন, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে তাঁর জীবনের প্রধান সমাজসংস্কার কর্মের প্রেরণার উৎস কোথায় তাও অনেকটা বোঝা যায়।

কলকাতায় আসার পর কয়েকদিনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশুনার সমস্যা দেখা দিল। কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামের মতো তখন পাঠশালা ছিল অনেক। বড়বাজারের একটি পাঠশালায় তিনি তিনমাস লেখাপড়া করেন। তারপর কঠিন অসুখ হয় এবং তিনি বীরসিংহে ফিরে যান। কলকাতার জল-হাওয়া খাবার-দাবার গ্রামের লোকের তখন সহ্য হত না। অসুখ-বিসুখে তাঁরা ভুগতেন এবং গ্রামে ফিরে গেলে আবার সুস্থ হয়ে উঠতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে ফিরে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, ১৮২৯ সালের মে মাসে। এইবার তাঁর শিক্ষার আসল সমস্যা দেখা দিল। কি পড়বেন তিনি, কি শিক্ষা করবেন? একালের ইংরেজীবিদ্যা, না সেকালের সংস্কৃতবিদ্যা? ইংরেজী ভাল, না সংস্কৃত ভাল, তাই নিয়ে তখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিতর্ক চলছিল। কাজেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষার ব্যাপারেও দু'টি দল হয়ে গেল। এক দল সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে, আর-এক দল

ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে। ইংরেজী অর্থকরী শিক্ষা, দেশের নতুন শাসকরাও ইংরেজ, কাজেই ইংরেজীশিক্ষা ভাল। এ যুক্তি ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস সমর্থন করলেন না। লেখাপড়া শিখে ঈশ্বরচন্দ্র বেশি পরিমাণে অর্থ রোজগার করবেন, তা তিনি চান না। বংশের পণ্ডিতী ব্যবসায়ই ভাল। সংস্কৃত শিখে ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে গিয়ে টোল-চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করবেন, এই ছিল ঠাকুরদাসের ইচ্ছা।

সেকালের সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বার্ষিক সম্মান-দক্ষিণা পেতেন। দয়েহাটার সিংহ-পরিবারে এই কারণে অনেক পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সঙ্গে এই সুযোগে ঠাকুরদাসের পরিচয় হয়। গঙ্গাধর সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করে দিতে বলেন। ঠাকুরদাসের আত্মীয় মধুসূদন বাচস্পতি তখন সংস্কৃত কলেজে পড়তেন এবং বৃত্তিও পেতেন। ঠাকুরদাস তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করেন। মধুসূদনও ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সংস্কৃত কলেজে পড়ালে ঠাকুরদাসের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিত হবেন, অধ্যাপনা করতে পারবেন, এবং প্রয়োজন হলে 'ল-কমিটির' পরীক্ষায় পাস করে আদালতে জজ-পণ্ডিতের চাকরিও করতে পারবেন। অবশেষে অনেক বিচার-বিবেচনার পর স্থির হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি হবেন।

৫

সংস্কৃত কলেজ

১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স ন'বছর। তার পাঁচ বছর আগে ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারি ৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ সালের ১ মে গোলদীঘির (কলেজ স্কয়ার) নতুন গৃহে সংস্কৃত কলেজ স্থানান্তরিত হয়। এখনও সংস্কৃত কলেজ এখানেই আছে। তখন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ) একই গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গৃহের দুইদিকে হিন্দু কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট, মধ্যভাগে সংস্কৃত কলেজ। হিন্দু কলেজ আধুনিক ইংরেজীবিদ্যা শিক্ষার আদি প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ও পুরাতন দুইযুগের শিক্ষাদর্শ প্রতিফলিত হলেও, গোলদীঘির একই গৃহে তাদের সহ-অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যাপার। নতুন ও পুরাতনের যা-কিছু উদার ও মহান তার মিলন-মিশ্রণে, এই শিক্ষায়তনে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র গড়ে উঠেছিল।

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হন এবং তিন বছর ছ'মাস এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। সংস্কৃত কলেজে গঙ্গাধর হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম গুরু। অধ্যাপনায় গঙ্গাধরের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। ব্যাকরণের মতো নীরস বিষয়কেও তিনি এত সরস করে পড়াতেন যে ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে

যেত। মুগ্ধবোধের মতো কঠিন ব্যাকরণও তাদের কাছে সুখ-পাঠ্য মনে হত। তিন বছরে মুগ্ধবোধ পাঠ শেষ করে, শেষ দু'মাসে অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের খানিকটা অংশ তিনি পাঠ করেন। প্রতিদিনের অধ্যাপনার কাজ শেষ করে গঙ্গাধর ছাত্রদের দিয়ে একটি করে উদ্ভট শ্লোক লিখিয়ে তার ব্যাখ্যা করে দিতেন। শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করে পরদিন ছাত্রদের তাঁর সামনে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করতে হত। এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক উদ্ভট শ্লোক শিখেছিলেন। এই শ্লোকগুলি 'শ্লোকমঞ্জরী' নামে একটি বইতে তিনি সংকলন করে গিয়েছেন।

তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজীশিক্ষারও সুযোগ ছিল। ব্যাকরণশ্রেণী থেকে প্রথমে ইংরেজীশ্রেণীতে প্রবেশ করতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র তাই করেন এবং বছর দুই ইংরেজী শিখে কৃতীছাত্র হিসেবে ভাল ভাল ইংরেজী বই পুরস্কার পান। ১৮৩৫ সালে কলেজ থেকে ইংরেজীশ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন। এরপর ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দু'বছর তিনি সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। যেমন গঙ্গাধরের, তেমনি জয়গোপালের ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জয়গোপালের মতো সুরসিক সু-পণ্ডিত সু-লেখক সহৃদয় ব্যক্তির সংস্পর্শে যাঁরা আসতেন, তাঁরা তাঁর কথা ভুলতে পারতেন না। তাঁর ক্লাসে বাঁধাধরা নিয়মে পড়াশুনো বড় একটা হত না। অধিকাংশ দিন সাহিত্যের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে কেটে যেত। কাব্য পড়াবার সময় তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করে ছাত্রদের ব্যাখ্যা করে দিতেন। কিন্তু

ব্যাখ্যা করবেন কি? শ্লোকের ভিতরের ভাব তাঁর মনে আবেগের সৃষ্টি করত এবং শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। ব্যাখ্যা মধ্যপথেই শেষ হয়ে যেত। চোখ দুটো তাঁর বাষ্পাকুল হয়ে আসত, গলার স্বর গদ-গদ হয়ে উঠত, এবং ছাত্রদের দিকে চেয়ে তিনি শুধু একটি কথাই বারংবার বলতেন –'আহা-হা! দেখ দেখি বাবারা কেমন সুন্দর লিখেছে, আহা-হা!' কয়েকবার তাঁর প্রায়রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে শুধু 'আহা-হা' শব্দ শোনা যেত। তারপর দেখা যেত, নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তর্কালঙ্কার মশায় বসে আছেন, কণ্ঠ তাঁর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দুইগাল দিয়ে অনর্গল চোখের জল ঝরে পড়ছে। সেদিনের মতো সাহিত্যের ক্লাস ঐখানেই শেষ হয়ে যেত। ভাববিহ্বল রুদ্ধকণ্ঠ অধ্যাপক চুপ করে বসে থাকতেন। ছাত্ররা অবাক হয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

দু'বছর ধরে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য অধ্যয়ন করেন জয়গোপালের মতো গুরুর কাছে। রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত শকুন্তলা রত্নাবলী মুদ্রারাক্ষস উত্তররামচরিত কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় জয়গোপালের সাহায্যে। এরকম একজন গুরুর কাছে সাহিত্যের রসাস্বাদনে দীক্ষা পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের আদি শিল্পী। এই আদিশিল্পীর সুযোগ্য গুরু ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। জয়গোপাল নিজে চমৎকার শ্লোক রচনা করতে পারতেন, ছাত্রদেরও রচনা করতে বলতেন। গদ্য ও পদ্য রচনা করে ছাত্রদের নিয়মিত দেখাতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র সহজে গদ্য-পদ্য রচনা করতে চাইতেন না, অথচ সাহিত্যের বার্ষিক পরীক্ষায়

রচনার জন্য তিনি পারিতোষিক পেতেন। একদিন জয়-গোপাল তাঁকে বলেন, 'কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনব না, তোমাকে পদ্য রচনা করতেই হবে।' গুরুর কথা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। "গোপালায় নমোঽস্তু মে" এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করে, জয়গোপাল ছাত্রদের শ্লোক রচনা করতে বলেন। সময় দেওয়া হয় একঘণ্টা। ঈশ্বরচন্দ্র গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুদেব, গোপাল তো অনেক আছেন, আমাদের সামনেই এক গোপাল বসে আছেন, এছাড়া বৃন্দাবনের গোপাল আছেন, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করব?" ছাত্রের নির্মল পরিহাসে খুশি হয়ে জয়গোপাল হাসিমুখে বলেন, "তোমাদের সামনের গোপালকে ছেড়ে দিয়ে, বৃন্দাবনের গোপালকে নিয়ে শ্লোক রচনা কর।" একঘণ্টায় পাঁচটি শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র রচনা করে-ছিলেন। তার মধ্যে একটি শ্লোক হল ঃ

নবনীতৈকচৌরায় চতুর্ব্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্‌ভাণ্ড কুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

ছাত্রের রচিত এরকম সু-ললিত ছন্দের সংস্কৃত শ্লোক শুনে জয়গোপালের মতো সাহিত্যরসিক যে অত্যন্ত প্রীত হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

জয়গোপালের বাড়িতে প্রত্যেক বছর খুব জাঁকজমক করে সরস্বতী পুজো হত। ছাত্রদের তিনি নিমন্ত্রণ করতেন। সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত, এই পাঁচ শ্রেণীর ছাত্ররা কেউ বাদ যেত না। পুজোর দিন তর্কালঙ্কার মশায়ের বাড়িতে দু'বেলা সকলে পেট ভরে আহার করত, সন্ধ্যার দিকে গান শুনত। ছাত্রদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে জয়গোপালও যোগ দিতেন, কিন্তু তারই মধ্যে আবার ছাত্রদের দিয়ে কাব্যরচনা

করিয়ে নেবার কথা তিনি ভুলতেন না। পুজোর আগের দিন ছাত্রদের তিনি বলতেন, পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা লিখে আনবে। অন্যান্য ছাত্ররা রাজি হলেও, ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হতেন না। একবার জয়গোপালের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন :

"লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্থাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্।"

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : "শ্লোকটি দেখিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন।" পুলকিত হবারই কথা। গুরু যখন দেখেন, শিষ্য তাঁরই প্রতিভার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। ছাত্রজীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও রসবোধ যে কত তীব্র ছিল, গুরু-শিষ্যের এই বৃত্তান্ত থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যগুরু জয়গোপাল কেবল যে সংস্কৃত সাহিত্যেরই অনুশীলন করতেন তা নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনেও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সেকালের খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে জয়গোপাল দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আদিযুগে এই পত্রিকার বিশেষ দান ছিল। এই দানের কৃতিত্ব কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের প্রাপ্য তো বটেই, কয়েকজন বাঙালী

পণ্ডিতেরও প্রাপ্য। এই বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার অন্যতম। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জয়গোপালের আরও একটি বড় কীর্তি আছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বহুকাল ধরে যে রামায়ণ ও মহাভারত পঠিত হয়েছে, তার সহজ ও সুললিত ভাষা যে অনেকটা পণ্ডিত জয়গোপালের কীর্তি, একথা আজ আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর এই মহাপণ্ডিত সাহিত্যগুরুর কাছ থেকে কেবল যে সংস্কৃত সাহিত্যের অগাধ সমুদ্রে অবগাহন করতে শিখেছিলেন তা নয়, নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে ভালবাসতে এবং তাকে সাহিত্যের যোগ্য বাহন করে তুলতে প্রেরণাও পেয়েছিলেন।

সাহিত্যপাঠ শেষ হলে ছাত্রদের অলঙ্কারশাস্ত্র পড়ানো হত। অলঙ্কার সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তার মাধুর্য বাড়ায়। সাহিত্যের পর ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারশাস্ত্রে শিক্ষা আরম্ভ হল। শিক্ষাগুরু পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। প্রেমচন্দ্রও জয়গোপালের ছাত্র ছিলেন, এবং জয়গোপালের মতো তিনিও খুব সাহিত্যরসিক ছিলেন। ছেলেবেলা থেকে প্রেমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি নানাবিধ কাব্যরচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠত। গ্রামে তখন কবিয়ালদের দল থাকত এবং একদলের সঙ্গে অন্যদলের কবিগানের লড়াই হত। একবার গ্রামের চাষীদের একটি কবি-দলের সঙ্গে অন্যদলের কাব্যলড়াই হয়। চাষীর দলটিকে বিদ্রূপ করে অন্যদলের কবিরা বলে যে চাষীরা হালচাষ করে, তারা আবার কাব্য ও হরিনামের মাহাত্ম্য কি বুঝবে? প্রেমচন্দ্র তখন বালক। কিন্তু পণ্ডিতবংশের ছেলে বলে গ্রামের চাষীরা তাঁকে তাদের দলের জন্য একটি গান বেঁধে দিতে অনুরোধ করে। বালক প্রেমচন্দ্র এই গানটি লিখে দেন ঃ

চাষা অতি খাসা জাতি, নিন্দা কি তাহার
কত দিব্য গুণাধার
প্রেমভরে হরিরে ডাকতে চাষার পূর্ণ অধিকার ॥
থাকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় সে স্বভাবের হাটে
চতুরালি নাহি তাহার।
কুটিল সমাজ যত্নে করে পরিহার ॥
স্বার্থের পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ
ভাবে ধর্ম এই তাহার।
প্রাণপণে যোগায় চাষা জগতের আহার ॥
কিবা গৃহী উদাসীন, চাষার অধীন চিরদিন
বিনা চাষে দুনিয়া আধার ॥
পেটে ভাত বিহনে ঘুরিয়ে ঘানি, ফল কি ভাব একটিবার ॥

ছেলেবেলা থেকে প্রেমচন্দ্র এইভাবে কবির দলে গান বেঁধে দিতেন এবং গ্রাম্য কবিগান ও তরজাগানের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। শোনা যায়, তাঁর কাব্যরচনার শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে, উইলসন সাহেব তাঁকে সংস্কৃত কলেজে সরাসরি সাহিত্যশ্রেণীতে ভর্তি হবার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রেমচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে রীতিমত কঠোর শৃংখলার সঙ্গে রচনা শিক্ষা করতে হয়েছিল। ছাত্রজীবনে তিনি কিছুতেই সংস্কৃত রচনা লিখতে চাইতেন না, কেউ কিছু লিখতে বললে তিনি পালিয়ে যেতেন। তর্কবাগীশ মশায়ের আগ্রহে তাঁর এই জড়তা কেটে যায়, তিনি সংস্কৃতে লিখতে আরম্ভ করেন।

১৮৩৮ সাল থেকে সংস্কৃত কলেজে নিয়ম হয় যে স্মৃতি ন্যায় ও বেদান্ত এই তিনটি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময়, গদ্যে ও পদ্যে, সংস্কৃত রচনা করতে হবে। সবচেয়ে ভাল

গদ্য রচনার জন্য একশো টাকা এবং পদ্য রচনার জন্য একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। একদিনেই দু'রকম রচনার পরীক্ষা হবে, বেলা দশটা থেকে একটা পর্যন্ত গদ্য রচনার, একটা থেকে চারটে পর্যন্ত পদ্য রচনার। প্রথম পরীক্ষার দিন বেলা দশটার সময় ছাত্ররা সকলেই উপস্থিত হল, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে কোথাও দেখা গেল না। তিনি কলেজের অন্য একটি ঘরে চুপ করে বসে ছিলেন। প্রেমচন্দ্র জানতেন যে তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র এরকম কাণ্ড করতে পারে। তিনি তাঁকে খুঁজে বার করলেন এবং রচনা লেখার জন্য অনুরোধ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই লিখবেন না, তর্কবাগীশ মশায়ও কিছুতেই ছাড়বেন না। অবশেষে তাঁকে লিখতেই হল। তিন ঘণ্টার অর্ধেক সময় কেটে গিয়েছে, বাকি সময়ের আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তিনি গদ্য রচনাটি লিখলেন। গদ্যরচনার বিষয় ছিল 'সত্য-কথার মহিমা।' গদ্যরচনায় ঈশ্বরচন্দ্রই পুরস্কার পান। পরের বছর পদ্য রচনায় তিনি পুরস্কার পান। রচনার বিষয় ছিল 'বিদ্যার প্রশংসা।' বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি আটটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। এইভাবে তর্কবাগীশ মশায়ের পীড়াপীড়িতে সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের ভয় ও সংশয় সম্পূর্ণ কেটে যায়।

১৮৩৬ সালের গোড়ার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কার পাঠ শেষ হয়ে যায়। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ পুরস্কার পান। ১৮৩৬ সালের মে মাস থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'বছর তিনি পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর একবছর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি

ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র হন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন তাঁর কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায়শাস্ত্র পাঠের সুযোগ হয়। ১৮৪০ সালে শিরোমণি মশায়ের মৃত্যুর পর বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন তাঁর কাছেও পড়েন। নারকেলডাঙ্গায় তিনি থাকতেন এবং সেখান থেকে একটি ছ্যাক্‌রা গাড়ি করে কলেজে আসতেন। তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে চলতেন। তালপাতার ছাতাটি কোন গোঁড়ামির চিহ্ন নয়। জয়নারায়ণের মতো উদারচরিত্র মানুষ তখনকার দিনে দেখাই যেত না। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ঠিক সমবয়সী বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর চরিত্রে শিশুর মতো এমন সরলতা ছিল যে ছাত্ররাও ঠিক বন্ধুর মতো তাঁর সঙ্গে মিশতে সংকোচ বোধ করত না। সামাজিক নানা-রকম বিষয়ে জয়নারায়ণের মতামত অত্যন্ত উদার ছিল। কেশব-চন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করে একবার নাকি তিনি বলেছিলেনঃ "কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়! ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে। ঈশ্বর ঈশ্বর না করে যদি বিলেতী কলকব্জা কেশব এদেশে আমদানি করে কারবার করার চেষ্টা করে তাহলে দেশের অনেক উপকার হতে পারে।" এরকম একজন সংস্কারমুক্ত উদার নৈয়ায়িক পণ্ডিতের যোগ্য শিষ্য হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ভবিষ্যৎ জীবনে।

ন্যায়শাস্ত্র ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ে-ছিলেন পণ্ডিত যোগাধ্যান মিশ্রের কাছে। বারো বছর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করার পর ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র পান। কলেজের অধ্যাপকরা সকলে মিলে দেবনাগর অক্ষরে লিখে সংস্কৃতে রচিত এই প্রশংসাপত্রটি দেন :

'অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে, অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানি-সংস্থাপিতবিদ্যা-মন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপ-স্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রাণ্যধীতবান।'

বাল্যকাল থেকে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন শেষ হয়।

ছাত্রজীবনে বিদ্যাসাগরেব চরিত্র সংস্কৃত কলেজের সুন্দর পরিবেশে গড়ে ওঠে। স্বল্পবিত্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই ছিল তাঁর সহপাঠী। হিন্দু কলেজেই বিত্তবান পরিবারের ছেলেরা পড়ত বেশি, সংস্কৃত কলেজে নয়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাই টাকার অহমিকা, অথবা বিত্ত-বৈষম্যের কোন আত্মগ্লানি কিছু ছিল না। অধ্যাপকদের উদার চারিত্রিক গুণ তাঁর কিশোরচরিত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কোন মালিন্য ও দৈন্য কোনদিন তাঁকে তাই স্পর্শ করতে পারেনি।

৬

কর্মজীবনের প্রথম পর্ব

গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজে প্রায় তের বছর ঈশ্বরচন্দ্র একরকম বন্দী হয়ে ছিলেন বলা চলে। তা থাকলেও বাইরের সামাজিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রাচীনকালের আশ্রম ও তপোবনের শিক্ষার যুগে হয়ত তা সম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিকযুগে তা সম্ভব নয়। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সালের মধ্যে বাংলাব সমাজ-জীবনে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। রাজা রামমোহন বায় প্রতিমা-পূজাব বিরুদ্ধে, এক ঈশ্বর উপাসনার জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। সামাজিক কুসংস্কাবেব মধ্যে সতীদাহ-সহমরণ তখন ভীষণ আকারে দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশে। বামমোহন সহমরণ নিবারণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে-ছিলেন। যে বছব বিদ্যাসাগব সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন (১৮২৯ সাল, জুন মাস) সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। তার ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮৩০ সালের জানুয়ারি মাসে হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হয়ে ধর্মসভা স্থাপন করেন। তার দু'বছর আগে ১৮২৮ সালে রামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। সতীদাহ বে-আইনী ঘোষিত হবার পর রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মসভার প্রচণ্ড বাদানুবাদ হতে থাকে। হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল বলে ধর্মসভাপন্থীরা চেঁচামেচি করতে থাকেন, ব্রাহ্মসমাজপন্থীরা তার

প্রতিবাদ করেন। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা বলেন যে ধর্ম মানে কু-সংস্কার নয়। কতকগুলি কু-সংস্কার পুষে রাখলে যে ধর্মকে রক্ষা করা হয় তাও ঠিক নয়।

ধর্ম নিয়ে যখন এরকম বাদানুবাদ চলছে তখন, ১৮৩০ সালের মে মাসে বিখ্যাত খ্রীষ্টান মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কলকাতা শহরে আসেন। এই বছরেই নভেম্বর মাসে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। রামমোহনের অনুপস্থিতিতে, সমাজ ও ধর্মের সংস্কারের জন্য তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন, তার দায়িত্ব বহন করেন 'ইয়ংবেঙ্গল' দল। ১৮২৯-৩০ সালে হিন্দুকলেজের একদল ইংরেজীশিক্ষিত ছাত্রদের 'ইয়ংবেঙ্গল' বলা হত। হিন্দুকলেজের একজন যুবক ইংরেজী-শিক্ষক ডিরোজিও তাঁদের নবযুগের প্রগতিশীল ভাবধারায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। ডিরোজিও ছিলেন তাঁদের গুরু, সেইজন্য কেউ কেউ তাঁদের 'ডিরোজীয়ান'ও বলত। সমাজ, ধর্ম ও জীবন সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার তাঁরা মানতেন না। এই 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের সঙ্গে ধর্মসভার গোঁড়া হিন্দুদের মতামতের সংঘর্ষ অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠল। রামমোহনের দল বয়সে প্রবীণ ছিলেন, তাই বিরোধীদলের সঙ্গে বাদানুবাদের মধ্যেও তাঁদের সংযম-বোধ থাকত। 'ইয়ংবেঙ্গল' তরুণের দল, তর্ক-বিতর্কের সময় স্বভাবতঃই তাঁদের ধৈর্য ও সংযমবোধ থাকত না। এই সময়ে ইয়ংবেঙ্গল ও ধর্মসভার সংঘাতকে তরুণ ও প্রবীণের বিরোধ বলা যায়। এই বিরোধ যখন বেশ তীব্র হয়ে ওঠে তখন হঠাৎ কয়েকদিনের অসুখে ১৮৩১ সালের ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজীওর মৃত্যু হয়। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে মৃত্যু হয় রামমোহন রায়-এর। ১৮২৯ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ শেষ করে

সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করেন তখন বাইরের সমাজে এই ঘটনাগুলি ঘটে যায়। প্রত্যেকটি ঘটনার গুরুত্ব আছে। সেই গুরুত্ব বুঝবার মতো বয়স ঈশ্বরচন্দ্রের না হলেও, তাঁর কিশোর মনে তার কোন ঘাত-প্রতিঘাত হয়নি, এমন কথা বলা যায় না।

১৮৪১ সালে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলনের তীব্রতা যে বিশেষ কমেছিল তা নয়, বরং বেড়েছিল বলা যায়। ইয়ংবেঙ্গলের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র একই প্রাঙ্গণ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার কারণ, আগেই বলেছি, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ তখন একই গৃহের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, একই প্রাঙ্গণে ছাত্ররা চলাফেরা করত। ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয় ডিরোজিওকে এবং তাঁর ছাত্রদের দেখেছেন। আরও একটি ব্যাপার হল, সংস্কৃত কলেজের অধিকাংশ পণ্ডিতঅধ্যাপক ধর্মসভার সমর্থক ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলে'র প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁরাই। নতুন ও পুরাতনের আদর্শসংঘাত ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের দেখবার যে-রকম সুযোগ হয়েছিল, তা সাধারণত কারও হয় না। এই সংঘাতের ভিতর থেকে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে পথের আভাস পেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এখন 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।' শিক্ষা শেষ হলে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন। কলেজ ছাড়ার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার ফোর্টউইলিয়াম কলেজের শেরেস্তাদারের (প্রধান পণ্ডিতের) পদে নিযুক্ত হন। ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এদেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সিবিলিয়ানদের বাংলা,

ফার্সি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য পণ্ডিত ও মুন্সী নিয়োগ করা হত। ইংরেজদের সঙ্গে এদেশের পণ্ডিতদের ভাব-বিনিময়ের একটি ক্ষেত্র ছিল এই কলেজ। কলেজের প্রায় শেষ পর্বে বিদ্যাসাগর প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং শিক্ষিত ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের বেতন ছিল মাসিক পঞ্চাশ টাকা। ঠাকুরদাস তখনও মাসিক দশ টাকা বেতনে চাকরি করতেন কলকাতায়। পণ্ডিতের কাজ পাবার পর বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসকে বলেনঃ 'বাবা, এখন আর আপনার সারাদিন খেটে দশ টাকা রোজগার করবার দরকার নেই। আমি তো পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাব, তাতেই কোন-রকমে কুলিয়ে যাবে। আপনি এখন দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। পঞ্চাশ টাকা থেকে কুড়ি টাকা করে প্রতিমাসে আমি আপনাকে পাঠাব, বাকি তিরিশ টাকায় আমার কলকাতার বাসা খরচ চলে যাবে।'

শহর ছেড়ে ঠাকুরদাস গ্রামে ফিরে গেলেন। প্রতিমাসে বিদ্যাসাগর কুড়িটাকা করে তাঁকে পাঠাতেন, তাতে গ্রামে পরিবারের খরচ চলত, বাকি তিরিশ টাকায় তিনি কলকাতার খরচ চালাতেন। বড়বাজার ছেড়ে বহুবাজার অঞ্চলে তখন তাঁকে বাসা করতে হয়েছে। দুই ভাই শম্ভুচন্দ্র ও দীনবন্ধু তাঁর সঙ্গে কলকাতায় থাকতেন। এছাড়া দু'জন খুড়তুতো ভাই, দু'জন পিসতুতো ভাই, একজন মাসতুতো ভাই ও শ্রীরাম নামে একজন ভৃত্যও তাঁর কলকাতার বাসাতে থাকত। বাসাভাড়া দিয়ে, এই ন'জনের আহারাদির খরচ তিরিশ টাকার মধ্যে চালাতে হত। রান্নাবান্না পালাক্রমে নিজেদেরই করতে হত। বিদ্যাসাগর নিজেও রান্না করতেন। রান্না করে খেয়ে দেয়ে

কলেজে চাকরি করতে যেতেন। বহুবাজার থেকে লালদীঘি (ডালহৌসি স্কয়ার) বেশি দূর নয়, হেঁটেই তিনি যাতায়াত করতেন।

কলেজের সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন মার্শাল বিদ্যাসাগরের কাজকর্মে, ব্যবহারে ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শিক্ষা-পরিষদের (কাউন্সিল অব এডুকেশন) সেক্রেটারি ডক্টর ময়েটের সঙ্গে তিনি তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মার্শাল সাহেব তাঁকে বললেন ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে। সিবিলিয়ান ইংরেজ ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজপত্র তাঁকে দেখতে হত, তার জন্য ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হল। মাসিক দশ টাকা বেতনে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত নিয়োগ করে তিনি হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। সকালে যতক্ষণ সময় পেতেন এই পণ্ডিতের কাছে হিন্দী শিখতেন। ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনও অবশ্য তিনি ডাক্তারি পাস করেননি। হেয়ার সাহেবের স্কুলে দুর্গাচরণ শিক্ষকতা করতেন, থাকতেন তালতলা অঞ্চলে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। প্রায় রোজ বিকেলে দুর্গাচরণ বেড়াতে আসতেন বিদ্যা-সাগরের বাসায়, এবং দুই বন্ধুতে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ইংরেজী শিক্ষার কথা উঠলে দুর্গাচরণ নিজেই তার ভার নেন। পরে হিন্দুকলেজের একজন ভাল ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে বিদ্যাসাগর কিছুদিন ইংরেজী শেখেন। এদিকে তাঁর সংস্কৃত চর্চাও অবিরাম চলতে থাকে। অনেকে তাঁর বাড়িতে এসে সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। যাঁরা তাঁর সংস্কৃতের ছাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়,

নীলমণি মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামাচরণ ও রাজকৃষ্ণের সঙ্গে পরে বিদ্যাসাগরের খুবই বন্ধুত্ব হয়। রাজকৃষ্ণ হলেন বহুবাজারের বিখ্যাত বেনিয়ান হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। বিদ্যাসাগর প্রথমে তাঁর বাড়ির কাছেই থাকতেন, পরে হৃদয়রামের বৈঠকখানাবাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করেন। রাজকৃষ্ণের বয়স তখন পনেরো-ষোল বছর। তিনি রীতিমত বিদ্যাসাগরের ছাত্র হয়ে উঠলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের মরুভূমি পার করিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে ক্রমে সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষাও পাস করালেন। রাজকৃষ্ণবাবুর সংস্কৃত শিক্ষার কথা শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। ধনিক বেনিয়ানবংশের দুলালকে সংস্কৃত পণ্ডিত করে তোলা যে কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা সকলেই জানতেন। এই অসাধ্য সাধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃত শিক্ষার ভয় ছাত্রের মন থেকে দূর করতে পারার জন্য। সবচেয়ে বড় ভয় হল সংস্কৃত ব্যাকরণ। যে-কোন ছাত্রই একথা জানে।

বাড়িতে বসে রাজকৃষ্ণের মতো ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার সময় বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল, কেমন করে ব্যাকরণের বাধা ও আতঙ্ক দূর করা যায়। ছাত্রজীবনে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মতো অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা পেয়েও বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন মুগ্ধবোধের মতো ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে কি ভয়ানক পরিশ্রম করতে হয়। তাই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণকে কতদূর সহজ ও সরল করা যায় ভাবতে আরম্ভ করেন। বহুবাজারের বাড়িতে বসে অবসর সময়ে দিস্তে দিস্তে কাগজে বাংলা অক্ষরে সরল সূত্রাকারে সংস্কৃত ব্যাকরণের খসড়া করতে থাকেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখা এবং সহজ সরল করে তার সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করার কাজ এই

সময় থেকেই তিনি আরম্ভ করেন। এই সমস্ত খসড়া থেকে পরে তিনি 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেন। দেবভাষা সংস্কৃতকে তিনি সাধারণমানুষের সহজবোধ্য ও শিক্ষণীয় ভাষা করে তোলেন।

প্রায় পাঁচবছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে কাজ করার সুযোগ পান। যে বিদ্যালয়ে তিনি নিজে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার উন্নতি কি করে করা যায় সে সম্বন্ধে প্রায় তিনি চিন্তা করতেন। এই সময় ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ খালি হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য আবেদন পত্র পাঠান। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব তাঁকে একটি ভাল প্রশংসাপত্র দেন। সহকারী সম্পাদকের পদে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্যাসাগর নিযুক্ত হন। মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকাই থাকে। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। এর কিছুদিন পরেই সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত স্থির করেন, বিদ্যাসাগর এই পদে নিযুক্ত হবেন। তাহলে তাঁব মাসিক বেতন আরও চল্লিশ টাকা বাড়ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই কাজটি নিলেন না, তাঁর সতীর্থ বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে দিয়ে দিলেন। তর্কালঙ্কার তখন ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত। কৃষ্ণনগর থেকে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে চলে এলেন।

খুব উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের কাজ করতে থাকেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থার কি করে উন্নতি করা যায়, সেই বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করে তিনি একটি রিপোর্ট সম্পাদকের হাতে দেন।

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবগুলির খুব প্রশংসা করেন। সম্পাদক রসময় দত্ত তাতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হন। রসময়বাবু নিজের সরকারী কাজকর্ম করে কয়েক ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করতেন। ঠিকে কাজ, কাজেই দৈনন্দিন বাঁধাধরা কাজের দায়সারা ছাড়া তিনি বিশেষ কিছু করতেন না। বিদ্যাসাগর সর্বক্ষণ মনপ্রাণ দিয়ে কলেজের কাজ করতেন, কলেজের কথা চিন্তা করতেন। তাঁর পক্ষে উপরের কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়া স্বাভাবিক। রসময়-বাবুর পক্ষেও বিরক্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। সহকারীর প্রভাব বাড়বে, তাঁর প্রভাব কমবে, এ তিনি কি করে সহ্য করবেন? বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের সমস্ত প্রস্তাবই প্রায় তিনি বাতিল করে দিলেন, কেবল ছাত্রদের অধ্যয়নকাল বারো থেকে পনেরো বছরে পরিণত করার প্রস্তাবটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল। এরপর থেকে কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখন যা প্রস্তাব করতেন, রসময়বাবু তাতে কর্ণপাত করতেন না! এইভাবে পদে পদে কাজে বাধা পেয়ে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ অনেকটা কমে গেল। তিনি হতাশ হয়ে গেলেন, বুঝতে পারলেন যে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁর পক্ষে কিছু করা খুব কঠিন। স্বাধীনভাবে যেখানে কাজ করা সম্ভব নয়, সেখানে কেবল মাসে মাসে কিছু টাকার জন্য কোনমতে চাকরি করার মানে হয় না। অতএব তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

তখনকার দিনে এককথায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দেওয়া বিদ্যাসাগরের মতো একজন দরিদ্র পণ্ডিতের পক্ষে কি করে সম্ভব, রসময়বাবু বুঝে উঠতে

পারেননি। তিনি কথায় কথায় একজনকে বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কি?' এইকথা শুনে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'দত্তমশায়কে বলো যে বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।'

সংস্কৃত কলেজে চাকরি ছাড়ার পর বিদ্যাসাগর আবার কিছুদিন ফোর্টউইলিয়াম কলেজে কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। এই কাজ তাঁর বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করতেন। কিন্তু তিনি ডাক্তারি করবেন বলে কাজ ছেড়ে দেন। ১৮৪৯ সালে জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর, মাসিক আশি টাকা বেতনে, এই কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে একাজ ছাড়তে হয়। ১৮৫০ সালে নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিতের চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে যান। শিক্ষাসংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এই শূন্য পদে বিদ্যাসাগবকে নিয়োগ করতে চান। সেকথা বিদ্যাসাগরকে জানানো হলে তিনি কতকগুলি শর্তে চাকরি নিতে রাজি হন। তিনি বলেন যে সংস্কৃত কলেজে শুধু চাকরির জন্য তিনি যেতে চান না। যে শিক্ষায়তনের তিনি ছাত্র, তার কোন উন্নতি যদি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব না হয়, কেবল গতানুগতিক পদ্ধতিতে অধ্যাপনা করে কাজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে তিনি সেইকাজ করতে চান না। শিক্ষা-সংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবকে তিনি জানান যে যদি তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে তাঁর কাজ করতে আপত্তি নেই। এই প্রস্তাবে শিক্ষা সংসদ সম্মত হন। ১৮৫০ সালের ৪ ডিসেম্বর ফোর্টউইলিয়াম কলেজের কোষাধ্যক্ষের কাজ ছেড়ে পরদিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজে যোগ দেন।

এই সময় রসময় দত্ত সেক্রেটারির কাজ ছেড়ে দেন। শিক্ষা-সংসদ গবর্নমেণ্টকে জানান: 'বাবু রসময় দত্ত গত দশ বছর ধরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোন জ্ঞান নেই বললেই হয়। তার উপর আরও একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে সারাদিন তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কলেজের কাজে তিনি কখনই ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারেন না। তার ফলে কলেজের অনেক ব্যাপারে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে এবং তার প্রতিকার না করলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এই কাজের জন্য উপযুক্ত লোক চাই। সংস্কৃতে পণ্ডিত কোন যোগ্য ইউরোপীয় কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে সংসদ মনে করেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। একদিকে ইংরেজী ভাষায় যেমন তিনি অভিজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃততেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। শুধু তাই নয়, তাঁর মতো উদ্‌যোগী, কর্মতৎপর ও বলিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে বিরল। তিনি যদি কলেজের অধ্যক্ষ হন, তাহলে বর্তমানে সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মশায়কে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা যায়। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে দেওয়া ভাল। এই দুই পদের মোট বেতন হল ১৫০ টাকা। অধ্যক্ষকে আপাতত এই বেতন দিলেই চলবে। পুরাতন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোন খরচ বাড়বে না।'

শিক্ষাসংসদের প্রস্তাব গবর্নমেণ্ট মঞ্জুর করেন। মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব পেয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের দিকে মন দেন। এ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ 'নোট' তিনি

তৈরি করেন। তাতে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যা বলেন তার গুরুত্ব আজকের দিনেও আছে বলে মনে হয়। তাঁর বক্তব্য মোটামুটি এই :

১। বাংলাদেশে যাঁদের উপর শিক্ষার দায়িত্ব আছে, তাঁদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সু-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ সংগ্রহ করে বাংলাভাষায় তা প্রকাশ করতে সক্ষম নন, তাঁরা কখনও আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষা ভাল জানেন না, তাঁবা ভাল বাংলাভাষা রচনা করতে পারবেন না। সুতরাং বাংলাসাহিত্যের উন্নতি করতে হলে একদিকে যেমন ইংরেজী ভাষায় সু-শিক্ষা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃত ভাষাও জানা প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, যাঁরা কেবল ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলাভাষা কিছু লিখতে পারেন না। তাঁরা এতবেশি ইংরেজীভাবাপন্ন যে তাঁদের কিছুটা সংস্কৃত শিক্ষা দিলেও তাঁদের পক্ষে ভাল বাংলা রচনা লেখা সম্ভব নয়।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র বাংলাসাহিত্যের শক্তিশালী লেখক হতে পারে।

এই যদি আসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে? সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কার সাহিত্য স্মৃতি প্রভৃতি সবই ছাত্রদের পড়তে হবে, তবে অ-প্রচলিত বই কিছু বাদ দিলে ক্ষতি নেই।

সংস্কৃতে গণিতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া একেবারে তুলে দিতে হবে। লীলাবতী ও বীজগণিতের যুগ চলে গিয়েছে। সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীতে গণিত শিক্ষা দেওয়া উচিত মনে হয়। সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা এই ঃ 'হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগে অচল। তাহলেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে পড়বে, তার আগে তারা ইংরেজী শিখবে এবং ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান হবে। ভারতীয় দর্শন ও ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, কোন্ দর্শনের মধ্যে কি ভুলভ্রান্তি আছে তাও তাদের পক্ষে বিচার করা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সেই দর্শন বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে সমস্ত পরিভাষা জানা দরকার তাও পণ্ডিতদের জানা থাকবে।'

সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগটিকে বিদ্যাসাগরমশায় ঢেলে সাজেন। এই বিভাগে দু'জন শিক্ষক ছিলেন, তার বদলে তিনি চারজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইংরেজী শিক্ষার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়।

এই খসড়াটির মধ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আগাগোড়া সমস্ত পরিকল্পনাটির মধ্যে একটি সুরেরই ঝংকার শোনা যায়। সেই সুরটি হল, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। তাঁর জীবনের জপ-তপ-ধ্যান ছিল নিজের মাতৃভাষার উন্নতিসাধন। দেশীয় মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে 'জীবনীশক্তি' সঞ্চয় করে, পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্য থেকে আধুনিক উপাদান সংগ্রহ করে, বাংলাভাষার উন্নতি করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সেইজন্য তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এই পরিকল্পনা নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তিনি গোড়াতে পেয়েছিলেন, কিন্তু খুব বেশিদিন তা করতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই চারিদিক থেকে নানারকমের বাধাবিপত্তি আসতে আরম্ভ করে। কাজকর্মে কোনরকম বাধা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, মতামতের ব্যাপারেও কখন কোন আপস করতেন না কারও সঙ্গে। এই মতামত নিয়েই শেষে সংস্কৃত কলেজের কাজে তাঁর বাধার সৃষ্টি হল। একজন বিখ্যাত ইংরেজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হল।

একবছর না যেতেই শিক্ষাসংসদ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনকে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করতে বলেন। ১৮৫৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে একজন পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ব্যালাণ্টাইন সাহেব কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁর সুদীর্ঘ রিপোর্টের মর্ম হল ঃ 'সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী দুই-ই পড়ানো হয় বটে, কিন্তু বর্তমানে দুই ভাষার বিদ্যার মধ্যে কোথায় মিল ও অমিল আছে তা ছাত্রদেরই ঠিক করে নিতে হয়। এই ঠিক করে নেবার ক্ষমতা সাধারণত ছাত্রদের থাকে না। তার জন্য এখন কলেজের যে নির্দিষ্ট পাঠ্য আছে তা ছাড়াও আরও কিছু বই পাঠ্য করা উচিত।' ব্যালাণ্টাইনের এই রিপোর্ট শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য করে লেখেন ঃ 'যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ব্যালাণ্টাইন প্রচলন করার কথা বলেছেন, আমি মনে করি না সেগুলি পাঠ করলে ছাত্রদের কোন উপকার হবে। যেমন মিল-এর (Mill) লজিক খুবই মূল্যবান বই। পড়তে হলে ছাত্রদের

আসল বইখানাই পড়া উচিত। তা না পড়ে ছাত্ররা যদি ব্যালা-ণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসার পড়ে, তাহলে ক্ষতি হবে বলে মনে হয়। বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ তিনখানি বই তিনি পড়াতে বলেছেন। আমার মনে হয় তার কোনটাই ভাল নয়। তারচেয়ে অনেক ভাল বই আমরা ছাত্র-দের পড়িয়ে থাকি! দার্শনিক বিশপ বার্কলের 'ইন্‌কয়ারি' বইখানি তিনি প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় এ বই পড়লে ছাত্রদের উপকারের বদলে অপকার হবে। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন আমাদের পড়াতেই হয়। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন সে সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নেই। কিন্তু ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের তাই এগুলি না পড়িয়ে উপায় নেই। আমার তাই ইচ্ছা ছিল, ভাল পাশ্চাত্ত্যদর্শন পড়াতে পারলে ছাত্ররা কার কি ভুলভ্রান্তি নিজেরাই তা বিচার করতে পারবে। বার্কলের বই আজকাল কেউ খাঁটি দর্শন বলে মনে করেন না। সুতরাং তাঁর বই কলেজের ছাত্রদের পড়াতে আমি মোটেই রাজি নই। ব্যালা-ণ্টাইন পাশ্চাত্ত্য ও হিন্দুদর্শনের মিল ও সমন্বয়ের কথা বলেছেন। এটা খুবই তাজ্জব ব্যাপার। দুই দর্শনের মধ্যে যেমন মিল আছে, তেমনি অমিলও আছে। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের কথা উঠতেই পারে না। আমাদের দেশে সম্প্রতি পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। যদি তাঁরা দেখেন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের বীজ প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, তাহলে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের অগাধ বিশ্বাস জন্মায়। তাঁরা সগর্বে বলেন যে আধুনিক বিজ্ঞান এমন কোন সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি, বা পারবে না, যা প্রাচীনশাস্ত্রে

নেই। এই মনোভাবের কারণ হল, এই পণ্ডিতদের নিজেদের প্রাচীন শাস্ত্র অথবা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান কোনটা সম্বন্ধেই ভাল ধারণা নেই। ব্যালান্টাইনের অধিকাংশ মতামতই আমি তাই সমর্থন করি না।'

বিদ্যাসাগরের মন্তব্য পড়ে শিক্ষাসংসদ বিশেষ খুশি হননি তাঁরা বিদ্যাসাগরকে লিখে জানান যে ছাত্রদের ব্যালান্টাইনের বইগুলি পড়াবার চেষ্টা যেন তিনি করেন এবং করলে ছাত্রদের পক্ষে ভালই হবে বলে তাঁদের ধারণা। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে ব্যালান্টাইনের সঙ্গে তিনি যদি চিঠিপত্রে কলেজের বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহলে কলেজের পক্ষে ভাল হবে। সংসদের এই উপদেশ বিদ্যাসাগরের আদৌ ভাল লাগার কথা নয়। ভাল তাঁর লাগেওনি। সংসদের সেক্রেটারি ময়েটকে তিনি একথা লিখেও জানালেন এবং কিছুদিন ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। ফিরে এসে কাজে মন দিলেন বটে, কিন্তু মনটা তাঁর হাল্‌কা হল না। শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগর-ব্যালন্টাইনের বিরোধ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করলেন না, বিদ্যাসাগরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিলেন। ১৮৫৪, ১৮৫৫ ও ১৮৫৬ এই তিন বছর মাত্র তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পেরেছিলেন। এই তিন বছর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। সেকথা পরে বলব। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সময় শিক্ষাবিভাগের 'ডিরেক্টার' গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁর রীতিমত মতবিরোধ হয়। বিরোধ ক্রমে বাড়তে থাকে। এক বছরের মধ্যে দেখা যায় তিনি 'ডিরেক্টারের' কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন (৫ আগস্ট ১৮৫৮)। ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর পদত্যাগ মঞ্জুর করে বাংলা সরকার ডিরেক্টারকে

লেখেন : 'পণ্ডিতমশায়ের পদত্যাগের ব্যাপারটা এরকম আকস্মিক হবে আমরা ভাবতে পারিনি। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, বিশেষ করে আমাদের দিক থেকে যখন কোন অসন্তোষের কারণ আমরা ঘটাইনি। যাই হোক, আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে জানাবেন যে এদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি দীর্ঘদিন উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।'

বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবকে তিনি এ বিষয়ে যে চিঠি লেখেন তাতে পরিষ্কার করে পদত্যাগের কারণটি খুলে বলেন। তিনি লেখেন : 'আমার পদত্যাগের একটি কারণ অসুস্থতা, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হত তাহলে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে আবার কাজ করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে সরকারী চাকরি করা নানাকারণে আমার কাছে অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। যে পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা হয়েছে, আমার ধারণা তাতে শুধু অর্থের অপব্যয় হবে, কোন কাজ হবে না। একথা আপনাকে বহুবার বলেছি। আপনি জানেন কতবার কাজে আমি বাধা পেয়েছি। সুতরাং পদত্যাগ করা ছাড়া আমার উপায় নেই।'

১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ সাল, এই বারো বছরের মধ্যে ন'বছর বিদ্যাসাগর নানাভাবে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আদর্শ ছিল মাতৃভাষার উন্নতি ও প্রসার। শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা ইংরেজীপন্থী ও সংস্কৃতপন্থী ছিলেন, তাঁদের কারও মতামত তিনি সমর্থন করতেন না। শুধু ইংরেজী শিখে যাঁরা আঁধা-ফিরিঙ্গি হন অথবা প্রাচীন সংস্কৃত শিখে টুলোপণ্ডিত হন, তাঁদের কাউকেই

তিনি প্রকৃত শিক্ষিত মনে করতেন না। এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং নতুন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানসম্পদ আহরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় করা, এই ছিল তাঁর শিক্ষার আদর্শ। সংস্কৃত কলেজকে তাই তিনি সেকালের টোল-চতুষ্পাঠী করতে চাননি, আবার তার সংলগ্ন হিন্দুকলেজের মতো 'দেশী সাহেব' তৈরির কারখানাও করতে চাননি। এমন একটি বিদ্যায়তন তিনি গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে ছাত্ররা আকাশের মতো উদার মুক্ত মন নিয়ে, নিজের দেশের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষাসংস্কৃতির যা- কিছু ভাল তা গ্রহণ করতে পারবে এবং যা-কিছু মন্দ তা বর্জন করতে পারবে। সরকারী ও বে-সরকারী নানারকমের বাধার জন্য তাঁর বাসনা চরিতার্থ হয়নি।

7

বাংলা শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষা

বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে শিক্ষার প্রসার হয় তারজন্য বিদ্যাসাগর গ্রামের পাঠশালাগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে বলেন। লেখাপড়া ও কিছু অঙ্ক শেখালেই কাজ হবে না। মোটামুটি শিক্ষা দিতে হলে ইতিহাস ভূগোল জীবনচরিত পাটিগণিত জ্যামিতি পদার্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্বও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তারজন্য পাঠশালায় একজন শিক্ষক থাকলে চলবে না, অন্তত দু'জন শিক্ষক থাকা চাই। শিক্ষকদের বেতনও বাড়াতে হবে। পাঠশালাগুলি যাতে কাজে প্রেরণা পায়, তারজন্য তার পাশাপাশি সরকারী প্রচেষ্টায় 'মডেল' স্কুল স্থাপন করতে হবে। প্রথম কাজের জন্য বাংলাদেশের চারটি জেলা -হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর—নিয়ে আপাতত কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। অন্তত গোটা পঁচিশ স্কুল এখনই স্থাপন করা উচিত। নগর ও গ্রামের এমন জায়গায় স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে যেন তার কাছাকাছি কোন ইংরেজী স্কুল বা কলেজ না থাকে। ইংরেজী স্কুল বা কলেজ থাকলে বাংলাশিক্ষার সমাদর হবে না।

হ্যালিডে তখন বাংলার ছোটলাট। তিনি বিদ্যাসাগরের খুব অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মডেল স্কুলগুলি স্থাপনের ও তত্ত্বাবধানের ভার নিন, এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কাজকর্ম করে কি করে এ কাজ

করার সময় পাবেন, তা নিয়ে শিক্ষাসংসদের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। হ্যালিডে কোন কথাই গ্রাহ্য করেননি, বিদ্যাসাগরকে তিনি এই কাজের ভার দেন। বিদ্যাসাগর হ্যালিডেকে একটি রিপোর্টে জানান যে ২১ মে থেকে ১১ জুন (১৮৫৪) পর্যন্ত মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময় হুগলি জেলায় অনেক গ্রামে ভ্রমণ করেছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহও লক্ষ্য করেছেন। ছুটি না থাকাতে যদিও তিনি অন্যান্য জেলায় যেতে পারেননি, তাহলেও সেইসব জায়গার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এইসব জায়গায় স্কুলঘর তৈরির জন্য দু'চার মাস অপেক্ষা না করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুল খোলা উচিত।

ঠিক এই সময় 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলে'র সভাপতি চার্লস্ উড ভারতের শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ' পাঠান। এই 'ডেসপ্যাচে'র উদ্দেশ্য হল: ১। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম তদারকের জন্য একটি আলাদা শিক্ষাবিভাগ গঠন করা দরকার; (২) বড় বড় প্রেসিডেন্সি টাউনগুলিতে একটি করে ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার; (৩) সকল শ্রেণীর স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পেতে হলে শিক্ষণবিষয়ে তাঁদের ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন এবং তারজন্য প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত; (৪) কলেজ ও হাইস্কুলের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন; নতুন মধ্য-বিদ্যালয় (Middle School) স্থাপন করা দরকার; (৬) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা পাঠশালা ও এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন; (৭) স্কুল-কলেজে সরকারী 'গ্রাণ্ট' দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

চার্লস উডের এই 'ডেসপ্যাচ' বা শিক্ষা-সনদ আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত উডের এই নির্দেশ অনুযায়ী মোটামুটি শিক্ষা-বিভাগের কাজকর্ম চলেছে এবং শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। উডের নির্দেশ আসার আগে বাংলাদেশের শিক্ষাসংসদের সভাপতি চার্লস ক্যামেরন বিলেতে শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবের মধ্যে তিনি জানান যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল, ইউরোপের মতো কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই যা শিক্ষার জন্য 'ডিগ্রী' দিতে পারে। সেইজন্য আগে ইউরোপের মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। ক্যামেরনের এই প্রস্তাব উড সাহেবের নির্দেশে গৃহীত হয়েছে দেখা যায়। আসল শিক্ষা হোক, না হোক, শিক্ষার জন্য একটা মার্কা বা 'ডিগ্রী' থাকা দরকার, কারণ তাতে ইংরেজ সরকারের পক্ষে চাকরির ক্ষেত্রে পাত্র নির্বাচন করার সুবিধা হবে।

উড সাহেবের নির্দেশ আসার পর শিক্ষাসংসদের বদলে 'পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন' বিভাগ গঠিত হয় এবং তার একজন 'ডিরেকটার' (ডি. পি. আই.) নিযুক্ত হন। তখন বিদ্যাসাগরের উপর বাংলাশিক্ষার প্রধান পরিদর্শকের দায়িত্ব দেবার অসুবিধা হয়। ছোটলাট হ্যালিডের মন রাখার জন্য অবশেষে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী ইন্‌সপেক্‌টার নিযুক্ত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ ছাড়াও তিনি এই কাজের জন্য অতিরিক্ত দু'শো টাকা বেতন পেতেন। কিন্তু স্কুল স্থাপন করলেই শিক্ষাসমস্যার সমাধান হয় না, তারজন্য ভাল পাঠ্য বই ও ভাল শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষকের অভাব তখন খুব বেশি, তার উপর

গ্রামের স্কুলের জন্য ভাল শিক্ষক পাওয়া আরও কঠিন। শিক্ষকদের জন্য 'নর্মাল স্কুল' বা ট্রেনিং স্কুল থাকা দরকার। বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব মঞ্জুর হল। ১৮৫০ সালের ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হয়। আলাদা কোন বাড়ি পাওয়া যায়নি বলে সকালে দু'ঘণ্টা করে সংস্কৃত কলেজে ক্লাস হত। স্কুলে দুটি শ্রেণী ছিল—উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার ভার ছিল প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, নিম্নশ্রেণীর ভার ছিল মধুসূদন বাচস্পতির উপর। স্কুল আরম্ভ হয় ৭১ জন ছাত্র নিয়ে, তার মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক ৫ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। পরীক্ষার পর কৃতী ছাত্রদের শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করা হত। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকায় প্রত্যেক জেলায় ৫টি করে স্কুল স্থাপন করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে ৫০ টাকা করে খরচ হত, গ্রামবাসীরা নিজেরা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের ব্যয় বহন করতেন। ডি. পি. আই.-এর নির্দেশ ছিল যে প্রথম ছ'মাস ছাত্ররা বিনাবেতনে পড়বে, তারপর সম্ভব হলে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু বেতন নিতে হবে।

সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালা, সবগুলি একসঙ্গে দেখাশোনার ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। ভারত সরকারের নির্দেশে যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তার নাম হল দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়ের 'স্পেশাল ইন্‌স্‌পেক্‌টার'। বয়স তখন তাঁর ৩৪।৩৫ বছর। কাজ করার সুযোগ পেয়ে, এবং স্বাধীনতা পেয়ে, কাজের উৎসাহ তাঁর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তাঁর পূর্ণযৌবনের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি দিয়ে তিনি শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের কাজে অবতীর্ণ হলেন।

এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার কাজও আরম্ভ হল। ১৮৫৬ সালের আগে এদেশের ইংরেজ সরকার মনে করতেন না যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোন দায়িত্ব তাঁদের আছে। খ্রীষ্টান মিশনারিরা, রাধাকান্ত দেব, প্যারীচরণ সরকার (বিখ্যাত ইংরেজী ফার্স্ট বুকের লেখক) প্রমুখ এদেশের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক কিছু কিছু স্ত্রীশিক্ষার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বেথুন সাহেব ১৮৪৯ সালে এদেশে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে তার নাম ছিল 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়', পরে নাম হয় 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়।' বর্তমানে এই বিদ্যালয়ই বেথুন স্কুল ও কলেজ বলে পরিচিত। বেথুন তখন শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, এবং তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও কাজকর্মে অক্লান্ত উৎসাহ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন করে তার অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে কাজ করার জন্য তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন। স্কুলের জন্য মেয়ে ছাত্রী পাওয়া তখন খুব কঠিন ছিল। তার জন্য বিদ্যাসাগর স্কুলের ঘোড়াগাড়িতে মনুসংহিতার একটি শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন, যার অর্থ হল—'পুত্রের মতো কন্যাদেরও খুব যত্ন করে শিক্ষা দেওয়া উচিত।'

১৮৫৪ সালে উড সাহেব তাঁর ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালের গোড়া থেকে বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্‌যোগী হন। বিদ্যাসাগর হলেন তাঁর প্রধান সহায়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি পরামর্শ করেন। বিদ্যাসাগর খুব উৎসাহিত হন এবং ছেলেদের মডেল স্কুলের মতো বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজেও এগিয়ে যান।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপর নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮, এই কয়মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার ছাত্রীসংখ্যা হয় ১৩০০। বাংলা-সরকারের মনোভাব স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ছিল, কিন্তু ভারতসবকার এ ব্যাপারে অর্থব্যয় করতে রাজী ছিলেন না। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তাঁরা নানাদিক থেকে অর্থের অভাব বোধ করছিলেন, সুতরাং তাঁদের কাছে এদেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার মতো একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অর্থব্যয় করা অপব্যয় বলে মনে হয়েছিল। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কোন আর্থিক সাহায্য কিছু করতে পারবেন না বলে বাংলার ছোটলাট হ্যালিডেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ভাবতসরকারের মনোভাব জানতে পেরে বিদ্যাসাগর নিরুৎসাহ হন। সরকারের সমর্থন পাবেন মনে করে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মনের আনন্দে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন কবেছিলেন এবং তারজন্য নিজের পকেট থেকে গোড়ার দিকে টাকা খবচ করতেও দ্বিধা করেন নি। তিনি যখন বুঝতে পাবলেন যে সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে না, তখন তাঁর মনে হল বালিকা-বিদ্যালয়গুলি উঠে যাবে। তার জন্য তিনি খুবই বেদনা বোধ করতে লাগলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হল যে এতদিনের শিক্ষকদের বেতন (৩০ জুন, ১৮৫৮ পর্যন্ত মোট প্রায় ৩৪৪০ টাকা) তিনি কি করে পরিশোধ করবেন! শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের কাছে তিনি লিখলেন: 'হুগলি বর্ধমান নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি গ্রামে অনেক আশা

নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। ভেবেছিলাম সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয় আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। গ্রামে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেরা খরচপত্র জোগাড় করে স্কুলের ঘর তৈরি করতে পারলে, স্কুল চালাবার খরচ তারা সরকারের কাছ থেকে পাবে, এই আমার ধারণা ছিল। এখন দেখছি যে তা মিথ্যা। আমার চিন্তা হল, দরিদ্র শিক্ষকরা এতদিন একটা আশা নিয়ে কাজ করেছেন, এক পয়সাও মাইনে পাননি, তাঁদের প্রাপ্য টাকাটা কোথা থেকে দেব!'

ভারত-সরকার শিক্ষকদের বেতনের এই টাকাটা অবশ্য মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৫৮, ২২ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে ভারত সরকার লেখেন : 'দেখা যাচ্ছে পণ্ডিতমশায় খুব একটা আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগ ও সরকারের কাছ থেকে সমর্থনও পেয়েছেন। সেই কথা বিবেচনা করে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে ৩৪৪০ টাকা বেতন পাওনা আছে সেই টাকা সরকার পরিশোধ করে দেবেন।' ডিসেম্বর মাসে ভারত-সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানার আগেই, নভেম্বর মাসে, বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মাসিক প্রায় ৫০০ টাকা মাইনের চাকরি ছাড়ার পর তাঁর পক্ষে নিয়মিত স্কুলের জন্য আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি উঠে যাক, একথা ভাবতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কোন কাজ আরম্ভ করলে তিনি সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। দেশের সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদের কাছে তিনি আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন এবং অনেকেই তাঁকে মাসে মাসে আর্থিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত

হলেন। সরকারী সাহায্য না পেয়েও বালিকা-বিদ্যালয়ের কাজ একরকম ভালই চলতে থাকল।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আর একটি বড় কাজ হল বেথুন বিদ্যালয় গড়ে তোলা। ১৮৫৬ সালের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল কমিটির সম্পাদক হন। স্কুলের অগ্রগতি সম্বন্ধে ১৮৬২ সালের ১৫ ডিসেম্বর একটি রিপোর্টে তিনি জানান: 'পড়া লেখা অঙ্ক পাটিগণিত জীবনচরিত, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিকপাঠ এবং সেলাই স্কুলের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা বাংলাভাষাতেই দেওয়া হয়, ইংরেজীতে নয়। একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, দু'জন তাঁর সহকারী শিক্ষয়িত্রী এবং দু'জন পণ্ডিত—এই পাঁচজন স্কুলে শিক্ষা দেন। ১৮৫৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা যে রকম দ্রুত বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হয় যে যাদের জন্য স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তাদের কাছে স্কুলের সমাদর হয়েছে। যাঁরা খুব বড়লোক তাঁরা এখনও তাঁদের ঘরের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না। তবে তাঁদের মধ্যে মেয়েদের ঘরে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ বেড়েছে। এটাও বেথুন স্কুলের পরোক্ষ প্রভাব বলতে হবে।' বিদ্যাসাগর যখন সম্পাদক ছিলেন তখন বেথুন স্কুলের যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল তা এই রিপোর্টের কয়েকটি কথা থেকেই বোঝা যায়।

কিছুদিন পরে ১৮৬৬ সালের শেষে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার কলকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগরের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন, কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার তখন অ্যাটকিন্‌সন

সাহেব। তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে জানান: আপনি হয়ত কুমারী কার্পেন্টারের নাম শুনেছেন। তিনি কলকাতায় এসেছেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।' বেথুন স্কুলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার্পেন্টারের পরিচয় হয় এবং প্রথম আলাপেই দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়। কার্পেন্টার তাঁর সঙ্গে কলকাতাব কাছাকাছি কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখতে চান। ১৮৬৬, ১৪ ডিসেম্বর তারিখে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার অ্যাটকিন্‌সন, স্কুল ইন্‌সপেক্‌টার উড্রো ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেব সঙ্গে কুমারী কার্পেন্টার উত্তরপাড়ার বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান। উত্তরপাড়া থেকে কলকাতায় ফেরাব পথে ঘোড়ার গাড়িটি উল্টে যায় এবং বিদ্যাসাগর এই দুর্ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাত পান। স্বনামধন্য লোককবি প্যারী-মোহন কবিরত্ন ওরফে ধীরাজ এই ঘটনা নিয়ে একটি পদ্য রচনা করেন। পদ্যটি এই:

'অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
কবে তুলেছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মাদ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকাতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এটকিন্‌সন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে।'

কার্পেণ্টার দেখলেন যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষিকার অভাব বেশি, এবং এই অভাব দূর না হলে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি এদেশে হবে না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বেথুন স্কুলে একটি 'নর্মাল স্কুল,' অর্থাৎ ট্রেনিং স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হল। সভায় বিদ্যাসাগর আমন্ত্রিত হলেন (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬) এবং তাতে যে কমিটি গঠিত হল বিদ্যাসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হলেন। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষিকাদের জন্য নর্মাল বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা যে সফল হবে না, তা তিনি গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন। কারণ আমাদের হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির মূল যে কত দৃঢ়, তা তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়। বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর সামনে এ করকম কথা বলেছেন, পরে কাজের সময় ঠিক তার বিপরীত আচরণ করেছেন। এদেশের লোকের পক্ষে মুখে বড় বড় কথা বলা যে কত সহজ, এবং কাজে তার সামান্য করাও যে কত কঠিন, তা অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে জীবনে তিনি বুঝেছিলেন। সুতরাং বিদেশিনী কার্পেণ্টার, অথবা গবর্নমেণ্ট, যে যাই বলুন আর যাই ভাবুন, স্ত্রী-শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য নর্মাল বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সফল হবে না, একথা তিনি বাংলার ছোটলাট গ্রে সাহেবকে একখানি পত্রে জানান (১ অক্টোবর ১৮৬৭)।

অবশেষে কার্পেণ্টারের কথাই রইল, স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় খোলা হল। বাংলা সরকার বেথুন স্কুল কমিটিকে লিখলেন ঃ 'ছোটলাট মনে করেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, তার চেয়ে আরও অনেক ভাল ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের মনে হয়, স্কুলটি

আরও ছোট করে, তার সঙ্গে শিক্ষিকাদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল খুলতে পারলে আরও ভাল কাজ হতে পারে। তা করতে হলে সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে বেথুন স্কুলের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। এতদিন একজন ইংরেজ সভাপতির অধীনে এদেশীয় লোকের একটি কমিটি স্কুল পরিচালনা করে এসেছেন। এখন কমিটির সদস্যরা বিভাগীয় ইন্‌সপেক্‌টারের অধীনে একটি পরামর্শসভার সভ্যরূপে কাজ করতে রাজি আছেন কিনা ছোটলাট জানতে চান।' বেথুন স্কুল কমিটি এই নতুন শর্তে স্কুল পরিচালনা করতে রাজি হন নি। স্কুল কমিটির সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর। কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। একজন ইংরেজ মহিলা বেথুন স্কুল ও নর্মাল বিদ্যালয়ের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হলেন। তাঁর মাসিক বেতন হল ৩০০ টাকা। বিদ্যাসাগর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। ২ মার্চ ১৮৬৯ স্কুল-ইন্‌সপেক্‌টার উড্রোসাহেব ডি. পি. আই-কে লিখলেন: 'বিদ্যাসাগর মশায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেথুন স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে স্কুলের ভেতর আমার সঙ্গে বেড়ালেন এবং স্কুলের উন্নতি সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবর্তা হল। স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিলেও তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে নর্মাল স্কুল বা বেথুন স্কুলের যে কোন কাজে যদি তাঁর সাহায্য দরকার হয় তাহলে তিনি সানন্দে তা করবেন।'

কার্পেণ্টারের পরামর্শে বাংলা সরকার নর্মাল স্কুল খুললেন, কিন্তু শিক্ষিকা হবার মতো মহিলা বিশেষ পাওয়া গেল না। কারা শিক্ষিকা হবেন? হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়,

কারণ ১০।১১ বছরের মধ্যে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায় এবং শিক্ষারও শেষ হয় বর্ণপরিচয় ও ধারাপাতের মধ্যে। নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু যাঁরা তাঁরা একাজ করতে আসবেন না। হিন্দু বিধবাদের পক্ষেও তখন তা করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে সামাজিক শাসন আরও বেশি কড়া ছিল। বাকি থাকেন খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম মহিলারা। এদেশের হিন্দুসমাজ থেকে যাঁরা খ্রীষ্টান হতেন, তাঁরা যাই হোন, বা যাই পান, সামাজিক স্বাধীনতা পেতেন না। আর ব্রাহ্মমহিলারা তখনও গোঁড়া হিন্দুদের মতো পর্দার আড়ালেই থাকতেন। কাজেই সামাজিক গোঁড়ামি ভেদ করে মেয়েদের পক্ষে শিক্ষিকার ট্রেনিং নিতে আসা সম্ভব হল না।

বিচক্ষণ বিদ্যাসাগরের কথাই ফলে গেল। তিনবছর পরে ছোটলাট ক্যাম্বেল ডি. পি. আই-কে লেখেন : 'বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিন বছর ধরে চেষ্টা করেও ফিমেল নর্মাল স্কুল সফল হয় নি। অতএব ১৮৭২, ৩১ জানুয়ারি থেকে স্কুলটি তুলে দেওয়া হোক'। নর্মাল স্কুল তুলে দেওয়া হল। তারপর স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য এবং সমাজের গোঁড়ামি দূর করার জন্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্রাহ্ম-যুবকরা আন্দোলন করতে আরম্ভ করলেন। এঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন বয়সে প্রবীণ। নবীন তরুণদের উৎসাহে তিনি প্রেরণা পেলেন। আন্দোলনের ফলে ২৭ এপ্রিল ১৮৭৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব পাস করা হয় যে এখন থেকে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হবে।

৮

স্বাধীন কাজকর্ম

সরকারী চাকরি ছাড়ার পর বিদ্যাসাগর বই লেখা ও বই প্রকাশ করার কাজে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি যে শুধু বই লিখতেন তা নয় ছাপার কাজকর্মও খুব ভাল বুঝতেন। নিজে 'সংস্কৃত প্রেস' নামে একটি প্রেস স্থাপন করেছিলেন এবং সেই প্রেস থেকে ছাপা বইপত্র বিক্রির জন্য 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী' নামে একটি বই-এর দোকানও খুলেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা বইপত্র থেকে তখন তাঁর মাসিক রোজগার ছিল প্রায় তিন-চার হাজার টাকা। এই আর্থিক স্বাধীনতা তাঁর ছিল বলে তিনি স্বাধীনভাবে অনেক কাজ করতে পেরেছেন। তাঁর এই ধরনের অনেক কাজের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল 'মেট্রোপলিটন ইনস্‌টিটিউসন্‌' ও 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফাণ্ড।'

সংস্কৃত কলেজের কাজ ছাড়ার পর বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় কীর্তি হল 'মেট্রোপলিটন ইন্‌সটিটিউসন্‌'। ১৮৫৯ সালে কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি ইংরেজী স্কুল কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে স্থাপন করেন। সরকারী স্কুলের চেয়ে অল্পবেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যাতে ইংরেজী শিক্ষা পেতে পারে সেইজন্যই স্কুলটি খোলা হয়। বিদ্যাসাগর মশায় সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়েছেন জানতে পেরে স্কুলের পরিচালকরা তাঁর ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

তাঁরা জানতেন যে বিদ্যাসাগরের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহ-যোগিতা পেলে স্কুলের দ্রুত উন্নতি হবে। বিদ্যাসাগর স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন এবং ১৮৬৪ সাল থেকে স্কুলের নতুন নাম হল—'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইন্‌সটিটিউসন্'। বিদ্যা-সাগরের পরিচালনার গুণে স্কুলের দ্রুত উন্নতি হয়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করতে থাকে। ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল মশায়কে নিয়ে স্কুলের নতুন একটি কমিটি গঠন করেন এবং তাঁব বিদ্যালয়ে যাতে বি. এ পর্যন্ত ছাত্ররা পড়তে পারে তারজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন করেন। বি. এ না হলেও, এফ. এ (ফার্স্ট আর্টস) পর্যন্ত পড়াবার অনুমতি তিনি পান। ১৮৭৪ সালে এফ. এ পরীক্ষায় তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এদেশের লোকের পরিচালিত বিদ্যালয়ের এই সাফল্য দেখে সকলে বিস্মিত হন, ইংরেজ শিক্ষাবিদরা বিদ্যাসাগরকে রীতিমত ঈর্ষা করতে থাকেন। ১৮৭৯ সালে 'মেট্রোপলিটন ইন্‌সটি-টিউসন্' এফ. এ কলেজ হল এবং ১৮৮১ সাল থেকে ছাত্রদের বি. এ পরীক্ষা দেবার অনুমতিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা দিলেন।

যে সময় উচ্চশিক্ষায় সর্বক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রভাব ছিল প্রায় একচ্ছত্র, সেই সময় নিজের স্বাধীন চেষ্টায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্কুল থেকে কলেজে পরিণত করা এবং শুধু তাই নয়, তার ছাত্রদের ভাল মেধাবী ছাত্র করে গড়ে তোলা যে কতখানি কৃতিত্বের ব্যাপার, আজকের দিনে আমরা তা কল্পনা করতে পারব না। রবীন্দ্র-নাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন, এর মধ্যে কেবল

তাঁর 'লোকহিতৈষা' ও 'অধ্যবসায়' নয়, 'সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি' প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিকে তিনি বলেছেন 'যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি' এবং 'এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।' মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দেখে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব মন্তব্য করেছিলেন—'The Pandit has done wonders'—পণ্ডিত আশ্চর্য কাজ করেছেন। ইংরেজ শিক্ষক-অধ্যাপক ছাড়া যে ইংরেজী উচ্চ-শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, একথা তখনকার দিনে কেউ কল্পনা করতে পারতেন না। তাই মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের কৃতিত্ব দেখে তাঁরা বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগর অসাধ্য সাধন করেছেন। মেট্রোপলিটান কলেজের বর্তমান নাম 'বিদ্যা-সাগর কলেজ'।

'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্নুইটি ফাণ্ড' বিদ্যাসাগরের আর-এক কীর্তি। দরিদ্র দেশের লোকের দুঃখকষ্ট কতটুকু দূর করা যায়, এই ছিল তাঁর চিন্তা। লোকের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর দ্বারা যতদূর যা সম্ভব হত, তা তিনি করতেন। বাংলার হিন্দু পরিবারের লোকজন সাধারণত একজন পুরুষের উপার্জনের উপর নির্ভর করে। কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পরিবারের স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজন সকলে অনাথের মতো অসহায় ও বিপন্ন বোধ করে। এইরকম এক-পুরুষ-নির্ভর হিন্দুপরিবারের ভবিষ্যৎ ভেবে বিদ্যাসাগর 'অ্যান্নুইটি ফণ্ড' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। যিনি মাসে মাসে ফাণ্ডে কিছু টাকা জমা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী, পুত্র অথবা অন্য কোন উত্তরাধিকারী তার দ্বিগুণের কিছু বেশি টাকা প্রত্যেক মাসে যতদিন বেঁচে থাকবেন পাবেন। আজকালকার ইন্‌সিওরেন্সের মতো

একসঙ্গে টাকা পাওয়া যেত না 'অ্যান্নুইটিতে'। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান বিদ্যাসাগর জানতেন যে অভাবের সংসারে হাতে একসঙ্গে টাকা পড়লে থাকে না। তা ছাড়া অনাথা বিধবা বা নাবালক পুত্রদের কুচক্রী আত্মীয়স্বজন ঠকিয়েও টাকাটা নিয়ে নিতে পারে। কাজেই মাসে মাসে টাকা পাওয়া ভাল। মাসে যদি কেউ দু'টাকা চার আনা করে দেন, তাহলে মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের কেউ মাসে পাঁচ টাকা করে পাবেন। এইভাবে মাসে ত্রিশটাকা পর্যন্ত সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়—পাঁচ টাকা থেকে ত্রিশ টাকা—তার বেশি নয়। তখনকার দিনে মাসিক এই টাকাই সাধারণ পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বড়লোকদের তো ব্যবস্থা থাকেই। তা ছাড়া বড়লোকদের জন্য ইন্‌সিওরেন্স আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অ্যান্নুইটি ফাণ্ড দরিদ্র ও সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য। ১৫ জুন, ১৮৭২ সালে অ্যান্নুইটি ফাণ্ড স্থাপিত হয়। তিন বছর পরে বিশেষ কারণে বিদ্যাসাগর ফাণ্ডের পরিচালকসভা থেকে বিদায় নেন। তার পরেও তিনিও ফাণ্ডের উন্নতির দিকে নজর রাখতেন। দরিদ্র পরিবারের একটি বড় আশ্রয় হয়ে ওঠে এই ফাণ্ড এবং কত হিন্দু পরিবার যে এর জন্য বেঁচে যায় তার ঠিক নেই।

৯

বিধবা-বিবাহ

সারাদিন সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের কর্তব্য করে, বিদ্যাসাগর ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কলেজের কাছাকাছি শ্যামাচরণ দে'র মতো দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে, তামাক খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে, সন্ধ্যার পর আবার সংস্কৃত কলেজে নিজের ঘরটিতে ফিরে যেতেন। ছাত্ররা তখন কেউ থাকত না, পণ্ডিত মশায়রাও সকলে বাড়ি চলে যেতেন। কলেজের বিরাট অট্টালিকা ও প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ ও নির্জন হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর নিজের ঘরটিতে তেলের একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বসতেন। তখন আর কোন চিন্তা থাকত না, কলেজের কথা ভুলে যেতেন, গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুলের কথা ভুলে যেতেন, বালিকা-বিদ্যালয়ের কথাও ভুলে যেতেন। কেবল একটি মাত্র চিন্তাই তখন তাঁর মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে থাকত। সেই চিন্তা হল, দেশের সমাজের নানারকম সমস্যার চিন্তা। তার মধ্যে তখন তাঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল, বালবিধবাদের জীবনের দুঃখ মোচনের চিন্তা। বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের বিধবা কন্যা রাইমণির মূর্তি তাঁর বালকচিত্তে এমনভাবে খোদিত হয়ে গিয়েছিল, যে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত তা ভুলতে পারেন নি। রাইমণির দুঃখ তিনি দেখেছেন, তাঁর গভীর মাতৃস্নেহের স্পর্শে হয়ত তাঁর মনের বেদনাও অনুভব করেছেন। পরে যত তাঁর বয়স বেড়েছে তত বাংলার সমাজের হাজার হাজার রাইমণির

বেদনার্ত মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তিনি ভেবেছেন, সমাজের এই রাইমণিদের জন্য কিছু করা যায় কিনা। তাঁর মনে হয়েছে, যে-সমাজ রাইমণিদের দুঃখ বোঝে না, তাদের বেদনায় কাতর হয় না, তার মতো নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সমাজ আর নেই।

সংস্কৃত কলেজের নির্জন ঘরে প্রদীপের আলোয় বিদ্যাসাগর শুধু গালে হাত দিয়ে বসে একথা ভাবতেন। কলেজের পাঠাগারে অনেক বই ছিল, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঁথিপত্রও ছিল অনেক। সেই সব প্রাচীন পুঁথির পাতা উল্টিয়ে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন খুঁজতেন। কি খুঁজতেন? প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকাররা কোথাও কোন পুঁথিতে এমন কথা লিখে গিয়েছেন কিনা যা থেকে বাল-বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেবার প্রস্তাব সমর্থন করা যায়। বিদ্যাসাগর জানতেন যে আমাদের দেশের লোক যুক্তি, বিচারবুদ্ধি মানেন না, শুধু শাস্ত্র মানেন। শাস্ত্রে কিছু লেখা আছে জানলে তাঁরা অন্ধের মতো তাকে বিশ্বাস করেন, শাস্ত্রকারদের কথা বেদবাক্যের মতো অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করেন। সুতরাং এই দেশের লোকের কাছে কোন সামাজিক প্রথা বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করা উচিত, একথা যদি বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে বোঝানো যায়, তাহলে কেউ বুঝতে চাইবে না। কিন্তু যদি বলা যায় যে একথা শাস্ত্রে আছে, শাস্ত্রকাররা বলে গিয়েছেন, তাহলে তা যতই অবিশ্বাস্য হোক তা তাঁরা বিশ্বাস করবেন। বিদ্যাসাগর তাই শাস্ত্রকারদের বচন খুঁজতেন পুঁথির পাতায়, এমন কোন বচন যা উদ্‌ধৃত করে দেশের লোকদের বোঝানো যেতে পারে যে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়। অনেক দিন গভীর রাত পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে তিনি অনুসন্ধানের

কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কোন-কোন দিন হয়ত রাত ভোর হয়ে যেত। অবশেষে শাস্ত্রীয় বচনটি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'পরাশর-সংহিতা' গ্রন্থে। সেটি এই :

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে।'

পরাশরের এই বচনের অর্থ হল : স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হন, মারা যান, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, ক্লীব বা পতিত হন, তাহলে এই পাঁচ প্রকারের আপদে নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়।

পরাশর-সংহিতার এই বচনটিতে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে আরও বেশি উৎসাহ পেলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বহু কাজের মধ্যে তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ছোট একখানি বইও লিখলেন। বইখানির নাম, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই ছোট বইখানি প্রকাশিত হয়। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। বিদ্যাসাগরের বইখানি প্রকাশিত হবার পরে যে আমাদের সমাজে প্রথম বিধবাবিবাহের আলোচনা আরম্ভ হয় তা নয়। বিদ্যাসাগরই যে প্রথম বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ সমাজের সামনে তুলে ধরেন, একথাও ঠিক নয়।

মানুষের জীবনের মতো সমাজের জীবনেরও নিজস্ব গতি ও ধারা আছে। হঠাৎ কখনও রাতারাতি সমাজের কোন সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয় না, অথবা সমাজের কোন একজন ব্যক্তি সেই সমস্যা বুঝতেও পারেন না। সমস্যাটি সমাজের ভিতরেই থাকে, মধ্যে মধ্যে এদিক-ওদিক

থেকে তা প্রকাশও পেতে থাকে। বাংলার সমাজে বিধবা-বিবাহের ব্যাপার নিয়ে ঠিক তাই হচ্ছিল। বিদ্যাসাগরের অনেক আগে রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হিন্দুকলেজের ছাত্র ডিরোজিওর শিষ্যরা এ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। ১৮৪০-এর কথা। সমাজে যখন প্রসঙ্গটা উঠেছে তখন দেশের বড় বড় রাজা-মহারাজা-জমিদার, যাঁরা দেশের সমাজপতি ছিলেন, তাঁরা মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতদের সভা ডেকে বিষয়টি বিচার করতে বলেছেন। সামাজিক ব্যাপারে কৃষ্ণ-নগরের মহারাজার তখন বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের আগে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে পণ্ডিতদের দিয়ে এরকম একটি বিচার করান। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে কোন মতামত জানাতে রাজি হন না। সমাজের ভয়, দেশাচারের ভয়, লোকনিন্দার ভয় তাঁদের এত বেশি যে সমাজের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা কোন কথা বলতে সাহস করেন না। তাঁদের ধারণা, এরকম অপ্রচলিত বিধান দিলে—তা যতই শাস্ত্রসম্মত হোক—দেশের লোক তাঁদের নাস্তিক বলবে, ধর্মচ্যুত বলবে। তাঁরা কৃষ্ণনগরের মহারাজাকে বলেন যে তাঁরা প্রকাশ্যে মতামত জানাতে পারেন যদি সারাজীবন তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগর মশায় পুস্তিকা লেখা বা আন্দোলন করার আগে বিধবাবিবাহ নিয়ে সমাজে আলোচনা চলছিল। তবে সেটা যে একটা খুব জোর আলোচনা বা আন্দোলন তা নয়। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের

পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর এই আলোচনা আলোড়নে পবিণত হল। পুস্তিকার গোড়াতে তিনি যা লিখলেন তার মর্ম এই ঃ

'এদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নেই। বিধবাবিবাহ দিতে হলে এক নতুন প্রথা প্রচলিত করতে হবে। তার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম কিনা। তা যদি না হয় তাহলে একথা উঠতেই পারে না, কারণ যে কাজ করা উচিত নয়, তা কোন ধার্মিক ব্যক্তি সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু যদি কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে এদেশের লোককে বলা যায় যে একাজ করা কর্তব্য, তাহলে তা তাঁরা বুঝতে চাইবেন না। যদি বলা যায় যে শাস্ত্রে একাজ করা কর্তব্য বলে উল্লেখ আছে, তাহলে কোনকিছু বিচার না কবে তা তাঁবা মেনে নেবেন। তাই এই ছোট বইখানিতে আমি বিচার কবে দেখাব যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ নয়।'

ছোট একখানি পুস্তিকা। তাতে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিচার করেছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পুস্তিকা-খানি প্রকাশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যেন একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। বই বিক্রির বহর দেখে তা বোঝা যায়। প্রথমে দু'হাজার কপি বইখানি ছাপা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বই বিক্রি হয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণে তিন হাজার কপি ছাপা হয়, তাও কয়েকদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। তাবপর একসঙ্গে দশ হাজার কপি ছাপা হয়, তাও বিক্রি হতে খুব দেরি হয়নি। অর্থাৎ প্রায় পনের হাজার বই কয়েকমাসেব মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। বইখানি যে কতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল তা আজকের দিনেও বিক্রির সংখ্যা দেখে যে-কেউ অনুমান করতে পারেন। সমাজের সর্বস্তরে একটা যেন কৌতূহলের

জোয়ার আসে। বিধবাবিবাহ! ভাবা যায় না। তাঁর উপর তার সপক্ষে লিখেছেন বিদ্যাসাগর। তাও ভাবা যায় না। অতবড় পণ্ডিতের কি শেষ পর্যন্ত মতিভ্রম হল! তাই বা কি করে ভাবা যায়! কৌতূহলের ঢেউ ক্রমেই বাড়তে থাকে। পথেঘাটের ফিস্ ফিস্, মৃদুগুঞ্জন, কথাবার্তা, আলোচনা ক্রমে দেখতে দেখতে বিরাট আলোড়ন ও কলরবে পরিণত হয়।

শুধু পুস্তিকা লিখেই বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হলেন না। কোন সমস্যা ধরলে তার শেষ না দেখে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। নানাজায়গা থেকে পণ্ডিতেরা তাঁর পুস্তিকার কঠোর সমালোচনা করেন। চারিদিক থেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের চোখাচোখা বাণ তাঁর উপর অনর্গল বর্ষণ হতে থাকে। মনে মনে যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন, তাঁরাও ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারতেন না। অনেকে ভেবেছিলেন যে পুস্তিকা পর্যন্তই হয়ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। দিগ্‌গজ পণ্ডিত, যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, পণ্ডিতমূর্খ বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের উত্তর দিলেন বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় পুস্তিকায়। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে এই দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হল। তারপর স্বভাবতঃই বিতর্ক ও বাদানুবাদ আরও অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠল। তাতেও বিদ্যাসাগর বিচলিত হলেন না। শুধু লিখে কাজ হবে না, একথা তিনি বুঝতে পারলেন। শাস্ত্রবচন তুলে অথবা যুক্তি দেখিয়ে কোন সামাজিক কুসংস্কার অথবা অকল্যাণকর দেশাচার দেশ থেকে দূর করা যায় না। তারজন্য শিক্ষার প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনেরও প্রয়োজন কম নয়। এ কথা দেশ স্বাধীন হবার পর হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন, উত্তরাধিকার আইন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইন ইত্যাদি পাস

করার সময় আমাদের দেশের সমাজনেতারা বুঝতে পেরেছেন। আজ থেকে একশো বছর আগে বিদ্যাসাগর একথা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বিধবাবিবাহের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজন সেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন।

১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর ভারতসরকারের কাছে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য একটি আবেদনপত্র পাঠান। এই আবেদনে ৯৮৭ জনের সই আছে দেখা যায়। সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের এই আবেদনপত্রে সই করেছিলেন। এই আবেদনের সমর্থনে ও প্রতিবাদে বাংলাদেশ থেকে এবং বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ভারতসরকারের কাছে অনেক পত্র পাঠানো হয়েছিল। কলকাতার শোভাবাজারের রাজবংশের রাধাকান্ত দেব তখন হিন্দুসমাজের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। বিদ্যাসাগরের আবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি যে আবেদনপত্র পাঠান, তাতে ৩৭ হাজার লোকের সই ছিল। এছাড়া নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভাটপাড়া বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলের শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা অনেকে বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবাদীদের যুক্তি হল, হিন্দু শাস্ত্রকাররা বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন না, দেশাচার বিধবাবিবাহের বিরোধী, কাজেই হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ অচল। এই কারণে ভারতসরকারের উচিত নয় আইন পাস করে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা। বিশেষ করে ভারতসরকার যখন বিদেশী সরকার, তখন অন্য দেশের সামাজিক প্রথায় তাঁদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমর্থকদের যুক্তি হল, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়, শুধু দেশাচারের দাস যাঁরা তাঁরাই বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন

না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার ফলে সমাজে নানারকমের দুর্নীতি ও ব্যভিচার দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় শুধু দেশাচারের মুখ চেয়ে এতবড় অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া সংগত নয়। যেখানে দেশাচার এত প্রবল, সেখানে আইনের জোর না থাকলে কোন সামাজিক কুসংস্কার দূর করা সম্ভব নয়। তারজন্য বিধবাবিবাহ আইন পাস করা দরকার।

এই সময় (১৮৫৫-৫৬) দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ও লোকের মুখে মুখে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অনেক ছড়া গান ও কবিতা প্রচারিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, এঁরা তখনকার জনপ্রিয় কবি ছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ নিয়ে অনেক কবিতা ও গান এঁরা রচনা করেছেন। এঁরা ছাড়া বাংলার আরও অনেক লোককবি এ বিষয়ে ছড়া গান লিখেছেন। কয়েকটির অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন:

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়ী আদি করি, মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখা পরে, কেহ থাকে মূলে।
করেছি প্রমাণ জড়ো, পাঁজিপুঁথি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখে না'ক গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি, ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি, অত কথা বলে।
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে॥

দাশরথি রায় বিধবাবিবাহ নিয়ে বেশ একটি বড় পালা-গান রচনা করেন। তার কিছুটা অংশ এই ঃ

বিধবা-বিবাহ কথা
কলির প্রধান স্থান কলিকাতা
নগরে উঠেছে অতি রব
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ
ক্রমে দেখছি বলবান
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব।
ক্ষীরপায়ে নগরে ধাম
ধন্য গণ্য গুণধাম
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক
তিনি কর্তা বাঙ্গালীর
তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়
হাকিমের হয়েছে রায়
আগে কেউ টের পায়নি সেটা
তারা কল্লে অর্ডর
যেতে কারে অর্ডর
চটিকে বুদ্ধি আটিকে রাখিবে কেটা।
... ...
হিন্দু ধর্মে যারা রত
প্রমাণ দিয়ে নানা মত
হবে না বলে করিতেছেন উক্ত
ইহাদের যে উত্তর
টিকিবে নাকো উত্তর
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত।
ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা।

এরপর অন্য সুরে ও ছন্দে লেখা হল :

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।
রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি
তা বলে দূত কখন দুষী হয় না সেই পাপে।
কি আর ভাব সকলেতে হবে যেতে জেতে হতে
জেতের অভিমান সাগরে দাও সঁপে।
এক ধর্ম প্রায় আগত ভারত আদি পুরাণ মত
ভারতে চলিবে না কোন রূপে।
যখন করেছে এ ভারত অধিকার ইংরেজ ভূপে।

আবার সুর ও তাল বদলে লেখা হল :

বিবাহ করিতে দিদি
আছে বিধবাদের বিধি
মরুক দেশের পোড়াকপালে
সকলে
কথা ছাপিয়ে রাখে হয়ে বাদী।
এলেন গুণের সাগর
আমাদিগে দিতে নাগর
বিদ্যাসাগর
বিধবা পার কত্তে তরির গুণ ধরেছেন গুণনিধি।...

এই ধরনের ছড়া গান কবিতা দেশের জনসাধারণের মুখে মুখে কত যে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে তার ঠিক নেই। গ্রামের গাড়োয়ানরা গাড়ি চালাতে চালাতে, চাষীরা লাঙ্গল চষতে চষতে, মাঝিরা নৌকা বাইতে বাইতে, কুমোরেরা চাক ঘুরোতে ঘুরোতে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে এইসব গান গাইত। শান্তিপুরের তাঁতিরা 'বিদ্যাসাগর-পেড়ে' নাম দিয়ে

একরকমের শাড়ি এইসময় বার করেছিল। তার পাড়ে একটি ছড়া বোনা থাকত। ছড়ার লেখক ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা কবি রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র—ওরফে রূপচাঁদ পক্ষী ঃ

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই ;
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোকলাজ ভয়ে।

শান্তিপুরের তাঁতিদের এই শাড়ি অনেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়ে যায়। ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপ করে একটি কবিতা লেখেন ঃ

শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান, বিধবাতারক॥
নত হবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ?
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই, বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে ?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায়॥

মিছামিছি অনুষ্ঠান, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ॥
সাগর যত্তপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে!
যাবে যাবে যায় শত্রু, যাক পরে পরে॥
তখন এরূপ করে, হলে ব্যতিক্রম।
ফাটায় পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম॥

গুপ্তকবির বক্তব্য হল: আইন পাস হল বটে, কিন্তু গোলে-মালে হরিবোল আর গণ্ডগোলই সার হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না। কারণ মুখে আমরা বড় বড় কথা বলি, কাজের বেলায় কিছু করি না। মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নয়। বিদ্যাসাগর ('সাগর' বলতে তিনি বিদ্যা-সাগরকে বলেছেন) যাই বলুন না কেন, তাঁর কাজের একটা সীমা আছে। অবশ্য সেই সীমা যদি তিনি লঙ্ঘন করতে পারেন, তাহলে হয়তো বিধবাবিবাহ ঘটতে পারে।

সাগরের ঢেউ হয়ত সীমা লঙ্ঘন করে না, কিন্তু বিদ্যা-সাগর কথার সীমা লঙ্ঘন করে কাজে বিধবাবিবাহ ঘটালেন। 'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা'—গুপ্তকবির এই বিদ্রূপের জবাব দিতে তিনি এগিয়ে এলেন। জুলাই মাসে (১৮৫৬) আইন পাস হল। ডিসেম্বর মাসেই তিনি নিজে উদ্যোগ করে একটি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বিবাহের পাত্র হলেন ২৪ পরগণার খাটুরা গ্রামনিবাসী

বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপনা করে পরে মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিতের কাজ করেন। পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। বিবাহের দিন স্থির হল ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬, বাংলা ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সন। বাংলার ও ভারতের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয়। আইনসঙ্গতভাবে আমাদের দেশে এই হল প্রথম বিধবা-বিবাহ।

বিবাহের দিন স্বভাবতঃই কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কৌতূহল মেটানোর জন্য বহু লোক বিবাহবাড়িতে উপস্থিত হয়। বিবাহ হয় রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। প্রায় ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়। পণ্ডিতদের জন্য আলাদা পত্র ছাপা হয়। পত্রগুলি সংস্কৃতে লেখা। তখনকার সাময়িকপত্রিকায় অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হয়। বিবাহবাসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহন রায়ের পুত্র), রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। এছাড়া আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ লোক অবশ্য মজা দেখতে গিয়েছিলেন। সেইজন্য লোকের ভিড় হয়েছিল খুব বেশি। রাস্তায় সার্জেন ও পুলিশ দিয়ে লোকের ভিড় সামলাতে হয়েছিল। রাত প্রায় এগারোটার সময় বর বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হন এবং নিমন্ত্রিত লোকজন তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করেন। যেমন হিন্দুবিবাহ হয় সেইভাবেই

সব করা হয়েছিল, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয়নি। উভয়পক্ষের পুরোহিত ছিলেন, তবে পাত্রীর মা লক্ষ্মীমণি নিজে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। স্ত্রী-আচার, উলুধ্বনি কোনকিছুই বাদ যায়নি। বিবাহের পর ভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিত, ভাট, কথক ও ভট্টাচার্যরা মিষ্টি মোণ্ডা খেয়ে, দু'চার টাকা করে দক্ষিণা নিয়ে বিদায় নিলেন। প্রথম বিধবাবিবাহ কলকাতা শহরে এইভাবে শেষ হল।

কলকাতার প্রথম বিধবাবিবাহের পরদিন পানিহাটি গ্রামে কুলীন কায়স্থবংশে একটি বিধবাবিবাহ হয়। পাত্র ঘোষ, পাত্রী মিত্র বংশের ১২ বছরের বিধবা কন্যা। এক্ষেত্রে কন্যার পিতাই সম্প্রদান করেন। শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে এই বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে বহুলোক যোগদান করেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাও অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কাজ-কর্মে সাহায্য করেছিলেন। পানিহাটির এই বিবাহের পর সাময়িকপত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন যে বেশ ব্যাপক হয়েছে তা এই অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ হয় রাজনারায়ণ বসুর পরিবারে। কলকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর পৈতৃক বাস। বিবাহের ব্যবস্থা করেন রাজনারায়ণ বসু নিজে। তাঁর পিতা ছিলেন রামমোহনের শিষ্য, তিনি নিজে ছিলেন হিন্দুকলেজের ছাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। সামাজিক ব্যাপারে তাঁর মতামত খুবই উদার ছিল। তাঁর জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মদনমোহন বসু বিধবাবিবাহ করেন। এই দুটি বিধবাবিবাহ হবার পর রাজনারায়ণ বসুর এক কাকা তাঁকে লেখেন যে তাঁর এই কাজের জন্য কায়স্থ-

কুল থেকে তাঁদের বেরিয়ে যেতে হবে। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে তাঁর জেঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন ঈশ্বর মুখুজ্যে নামে গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁর পাল্কির ভেতর মুখ দিয়ে বলেন 'দুর্গা, তোর মনে এত ছিল, একেবারে মজালি।' রাজনারায়ণ বসু নিজে তখন মেদিনীপুর থাকতেন এবং শিক্ষকের কাজ করতেন। নিজের ভাইদের বিধবাবিবাহ দেবার পর মেদিনীপুরের সরকারী উকিল হরনারায়ণ দত্ত তাঁকে বলেছিলেন যে 'রাজনারায়ণবাবু জানেন না যে তিনি বাংলা-ঘরে বাস করেন।' একথা বলার অর্থ এই যে তিনি যখন বাংলাঘরে বাস করেন তখন অনায়াসে তা পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর স্কুলের সেকেণ্ডমাস্টার উত্তরপাড়ার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দু'জনে কাছে এক জঙ্গলে গিয়ে দুটো মোটা মোটা লাঠি কেটে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য হল, যদি বিধবাবিবাহের জন্য দাঙ্গা হয় তাহলে লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করবেন। বোড়ালের লোকজন তাঁকে বলেছিলেন যে গ্রামে ফিরে এলে ইটপাটকেল মেরে তারা তাঁকে তাড়াবে। এইসময় একবার বোড়ালে তিনি গিয়েছিলেন। সাধারণত বাইরের বাড়িতেই তখন তিনি শুতেন। বিধবা-বিবাহের পর একদিন বোড়ালে এসে রাত্রে তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন, এমন সময় দেখেন প্রদীপ হাতে তাঁর মশারির দিকে কে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে তিনি দেখেন যে আর কেউ নয়, প্রদীপ হাতে তাঁর মা দাঁড়িয়ে আছেন মশারির পাশে। তাঁর দিকে চেয়ে মা বলছেন, 'রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল'। এই বলে অনেক অনুযোগ তিনি করতে লাগলেন। তাঁর পরিবারে এই গুণধর পুত্র রাজনারায়ণ

বসুর চক্রান্তে দুটি বিধবাবিবাহ ঘটে যাওয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। বিয়ের সময় তিনি ছিলেন মথুরায়। যদি তিনি বাড়ি থাকতেন তাহলে অবশ্য বিধবা-বিবাহ দেওয়া রাজনারায়ণের পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ছিলেন তখন বেশির ভাগ ব্রাহ্মরা এবং তরুণ শিক্ষিত যুবকরা। সেদিন তাঁদের যথেষ্ট সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসুর বিধবা-বিবাহের এই ঘটনার প্রায় ১০।১১ বছর পরেই শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বিধবাবিবাহ দিয়ে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। শাস্ত্রীমশায় তাঁর আত্মচরিতে এ সম্বন্ধে যা লিখে গিয়েছেন তার মর্ম এই ঃ

'আমি ছেলেবেলা থেকে বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষে। একবার আমি একটি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করি এবং সংবাদটা নিয়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে যাই। বিধবা মেয়েটি হল ঈশানচন্দ্র রায় নামে মেডিকাল কলেজের এক ছাত্রের বিধবা বোন। ঈশান ও তাঁর বিধবা বোনকে বিদ্যাসাগর আগে থেকেই জানতেন এবং যতদূর মনে হয় তিনি কিছু কিছু অর্থসাহায্যও তাঁদের করতেন। মেয়েটির নাম মহালক্ষ্মী, পাত্রের নাম যোগেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সঙ্গে যোগেনের বিবাহের সংবাদ পেয়ে তিনি খুব আনন্দিত হলেন এবং আমাকে বললেন যে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে বিবাহ দেবেন। দিন স্থির হল এবং দু'চারজন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করে বিবাহ দেওয়া হল। খরচ-খরচা যা-কিছু সব বিদ্যাসাগর মশায় করলেন, মেয়েকে কিছু গহনাগাটিও দেওয়া হল। তারপরই আমাদের উপর ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ

হল। যোগেন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। বাড়িতে চাকর-চাকরাণী পর্যন্ত পাওয়া দায় হয়ে উঠল।'

বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ও অনুগামীদের যখন এই নির্যাতন সহ্য করতে হত, তখন বিদ্যাসাগরকে যে কত রকমের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত তা সহজেই কল্পনা করা যায়। শোনা যায়, হিন্দুসমাজের গোঁড়া দলপতিরা ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে তাঁকে পথেঘাটে হত্যা করার পর্যন্ত চক্রান্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর পথে বেরুলে চারিদিক থেকে লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরত। কেউ পরিহাস করত, কেউ গালি দিত, কেউ কেউ তাঁকে প্রহার করবে, এমন কি মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাত। বিদ্যাসাগর এসব কিছুই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। একদিন তিনি শুনলেন, কলকাতার কোন বিশিষ্ট ধনিক তাঁকে মারবার জন্য লোক লাগিয়েছেন। বিদ্যাসাগর খবর পেয়ে সেই ধনিক ব্যক্তিটির বাড়িতে হঠাৎ নিজে গিয়ে হাজির হলেন। বড়লোকদের যা রীতি, তিনি তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও বয়স্যদের নিয়ে আমোদ করছিলেন, এবং ভাবছিলেন যে বিদ্যাসাগরকে প্রহারের সংবাদ নিয়ে গুণ্ডারা কখন ফিরে আসবে। এইসময় হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে তাঁরা অ-প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। একজন বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ তাঁর এইভাবে আসার উদ্দেশ্য কি? বিদ্যাসাগর বললেন, 'আমি শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনারা লোক লাগিয়েছেন। তারা নাকি আহারনিদ্রা ছেড়ে কলকাতার পথে পথে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আমি ভাবলাম, অনর্থক আপনারা কেন এত হাঙ্গামা করেন, আর ঐ ভাড়াটে লোকগুলোই বা কেন এত কষ্ট পায়। আমি নিজে

গেলেই যখন ঢুকে যায় তখন নিজেরই যাওয়া ভাল। এই মনে করে আপনাদের এখানে চলে এলাম। এবারে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করুন, আমি স-শরীরে উপস্থিত।' সকলে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। দু'একজন আমতা-আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিলেন বোঝা গেল না। একে একে ঘর থেকে উঠে সকলে প্রস্থান করলেন। শত্রুর চেহারা দেখে হাসতে হাসতে বিদ্যাসাগর মশায় বাড়ি ফিরে এলেন।

বেশির ভাগ বিধবাবিবাহ কলকাতা শহরে হয়েছে, বাইরের গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি হয়েছে, বেশি হয়নি। অধিকাংশ বিবাহের আয়োজন থেকে আরম্ভ করে অনুষ্ঠান পর্যন্ত সব প্রায় বিদ্যাসাগর মশায়কে একলাই করতে হত। অনুষ্ঠানের খরচ-খরচাও সবই প্রায় তিনি বহন করতেন। দৈহিক সামর্থ্য ও মানসিক উৎসাহ ধীরে ধীরে তাঁর কমে এল। লোকজনের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। যাঁরা তাঁকে সমর্থন করবেন, প্রত্যক্ষ কাজ-কর্মে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা একেএকে সমাজের চোখরাঙানিতে ভয় পেয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে লাগলেন। এমন কি বিবাহের ব্যাপারে সামান্য আর্থিক সাহায্য করতেও শেষকালে তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন। তাঁদের মনোভাব এই যে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে কোন সংশ্রব না রাখাই ভাল। রাখলে অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক বিপদ। অতএব সমাজের কল্যাণের চেয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোই তাঁদের কাছে বড় কর্তব্য হয়ে উঠল। একটা বড় সামাজিক কর্তব্য শেষ পর্যন্ত যেন অনেকটা বিদ্যাসাগরের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিণত হল। কেবল দেহ-মনের ক্লান্তিতে তিনি যে অবসন্ন হয়ে পড়লেন তা নয়, অর্থের দিক দিয়েও দেনার দায়ে

জড়িয়ে পড়লেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের তাগিদ আসতে লাগল। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথের পিতা) ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁকে বেশ কড়া তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখলেন। এই চিঠির উত্তরের মধ্যে বিদ্যাসাগরের তখনকার মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায়। উত্তরে তিনি যা লেখেন তার মর্ম এই ঃ

'আমি ক্রমাগত কয়েকদিন চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু তোমার দেনা চুকিয়ে দেবার কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। খুব তাড়াতাড়ি যে তোমার দেনা শোধ করতে পারব তা মনে হয় না। তুমি খুব ভালভাবেই জান যে আমি নিজের কোন প্রয়োজনে দেনা করিনি। বিধবাবিবাহের খরচ কুলিয়ে ওঠার জন্য শুধু তোমার কাছে নয়, আরও অনেকের কাছে দেনা করেছি। এই ভরসায় দেনা করেছিলাম যে অনেক সংগতিপন্ন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে অর্থ সাহায্য করবেন, এবং সেই অর্থে আমি দেনা শোধ করতে পারব। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞা পালন করেননি। এদিকে বিধবা-বিবাহের খরচ ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে, এবং তারজন্য আমি খুব বিপদে পড়েছি। যদি তাঁরা তাঁদের কথা রাখতেন তাহলে আমাকে এরকম বিপদে পড়তে হত না। কেউ বলেছিলেন মাসে মাসে সাহায্য করবেন, আবার কেউ কেউ এককালীন সাহায্যের কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কথাই কেউ বিশেষ রাখেন নি। যাঁরা একথা বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তুমিও একজন। তুমি মাসে মাসে ও এককালে সাহায্য করবে বলে সই করেছিলে। আশা করি সেকথা তোমার মনে আছে। এককালে যা দেবে বলেছিলে তার অর্ধেক দিয়েছ, বাকি অর্ধেক আজও দাওনি। মাসে মাসে যা দেবে বলেছিলে তাও

কিছুদিন দিয়ে অনেকদিন হল দেওয়া বন্ধ করেছ। এইভাবে বিধবাবিবাহের আয় কমেছে, কিন্তু ব্যয় ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে তাই আমাকে লোকের কাছে হাত পাততে হয়েছে এবং দেনার দায়ে আমি জড়িয়ে পড়েছি। এই দেনা যে কি করে শোধ করব আপাততঃ ভেবে কূল পাচ্ছি না। যাই হোক, তারজন্য তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বিধবাবিবাহের জন্য হলেও দেনা যখন আমি করেছি এবং তার দায়িত্ব যখন শেষ পর্যন্ত আমাকেই নিতে হবে, তখন যে-ভাবেই হোক তা শোধ করবার ব্যবস্থাও আমি করব। যদি আর কোন উপায়ে না পারি তাহলে নিজের বাড়িঘর সম্পত্তি বিক্রি করেও করব। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, তোমার টাকা তুমি ফেরৎ পাবে। এখনই দিতে পারলাম না বলে খুবই দুঃখিত।'

চিঠির শেষে বিদ্যাসাগর দুঃখ করে লেখেন ঃ

'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ একথা যদি আগে জানতাম, তাহলে কখনই বিধবাবিবাহ নিয়ে এরকম আন্দোলন করতাম না। তখন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমাকে কথায় যে-রকম উৎসাহ দিয়েছিলেন, তারই ওপর নির্ভর করে আমি কাজে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তা না হলে বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়া পর্যন্ত যা করবার করে ক্ষান্ত থাকতাম। বড় বড় দেশহিতৈষী ব্যক্তিদের মুখের কথায় বিশ্বাস করে শেষকালে আমি ধনেপ্রাণে মারা পড়লাম। অর্থ দিয়ে সাহায্য করা দূরে থাকুক, আজকাল কেউ একবার ভুলেও কোন খবর পর্যন্ত নেন না।'

কেবল বন্ধুদের এই ব্যবহারে যে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হয়েছিলেন তা নয়। যে কয়েকজন তখন বিধবাবিবাহ

কবতে রাজি হতেন, তাঁরা যে প্রতারক একথা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। সৎসাহস, অথবা আদর্শ, কোনকিছুই তাঁদের ছিল না। বিধবাবিবাহের নামে তাঁরা বহুবিবাহ করতেন। তার মধ্যেও কোন গুরুত্ব থাকত না। বিধবাবিবাহ করতেন কিছু অর্থপ্রাপ্তির লোভে। তাঁরা জানতেন যে বিধবা-বিবাহ করলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে, তাই সাময়িক লোক-নিন্দায় কান না দিয়ে কোনরকমে তাঁরা বিবাহ করে ফেলতেন। তারপর সেই বিবাহিত স্ত্রীকে তাঁরা স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করে চলে যেতেন। বিধবার অবস্থা বিবাহের পরে আরও শোচনীয় হত, তাঁদের একূল-ওকূল দুকূল-ই ভেসে যেত। তাঁদের না থাকত বাপের বাড়ি, না থাকত শ্বশুরবাড়ি। কোন বাড়িতেই তাঁদের স্থান হত না, সমাজে তো নয়ই। বিধবাবিবাহের এই পরিণতি দেখে বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিভে গিয়েছিল। মানুষের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা ও অ-বিশ্বাস হয়েছিল যে এদেশের লোকদেব দিয়ে কোন সামাজিক ভাল কাজ করানো যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তবু তিনি একেবারে হাল ছাড়েননি। ছাড়তেও পারেন না। প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে শেষকালে তিনি একটি চুক্তিপত্রে পাত্রকে দিয়ে সই করিয়ে নিতেন। চুক্তিপত্রটি এই ধরনের। পাত্রীকে সম্বোধন করে পাত্র লিখে দিতেন ঃ

'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও আইনসঙ্গত জেনে আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করলাম এবং আজ থেকে আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ হল। অর্থাৎ তুমি আমার স্ত্রী হলে, আমি তোমার স্বামী হলাম। ধর্মসাক্ষী করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে স্বামীর কর্তব্য আমি পালন করব এবং যতদিন

তুমি বেঁচে থাকবে, আমার যতদূর ক্ষমতা তোমাকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখব। তোমাকে কখনও অযত্ন ও অনাদর করব না। এও প্রতিজ্ঞা করছি যে তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে আমি আর বিবাহ করব না। যদি কোন কারণে অন্য বিবাহ করি তাহলে তোমাকে এককালীন এক হাজার টাকা দান করব। ইচ্ছা করলে তখন তুমি পৃথক হয়েও থাকতে পারবে এবং তার-জন্য তোমাকে প্রতিমাসে দশ টাকা করে দেব।' এক টাকার স্ট্যাম্প কাগজে এই চুক্তিপত্র লেখা হত এবং তাতে চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের সই থাকত।

বিধবাবিবাহ আইন পাসের সময় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধা-নাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্ররা এবং আরও কেউ কেউ বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাব করে ভারতসবকারের কাছে আবেদন কবেছিলেন। পরে বিদ্যা-সাগর মশায় নিজে বিধবাবিবাহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন যে রেজিস্ট্রেশনের মতো কিছু একটা করা দরকার। ১৮৭২ সালের 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট', ইয়ংবেঙ্গলেব প্রস্তাব এবং বিদ্যাসাগরের চুক্তিপত্রের মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই। বোঝা যায়, হিন্দুবিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠানটির প্রতি বিদ্যাসাগরের বেশ খানিকটা দুর্বলতা ছিল। 'সিভিল ম্যারেজ' বা রেজেস্ট্রিবিবাহ তিনি নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন, কিন্তু হিন্দুবিবাহের অনুষ্ঠানটি বজায় রেখে যদি তা করা সম্ভব হত তাহলে তিনি মনে মনে খুব খুশি হতেন। একথা তিনি কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুরাগী বন্ধুদের 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' আন্দোলনের সময় বলেছিলেন। এই অ্যাক্টে যে বিবাহ বিচ্ছেদ (ডিভোর্স) মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক

বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল, তাতে বিদ্যাসাগর খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। আগে যে চুক্তিপত্রের কথা বলেছি তার খসড়া তিনি নিজেই করেছিলেন। এর মধ্যেই পরবর্তী-কালে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট'-এর বীজ রয়েছে দেখা যায়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত চুক্তিপত্রেও বিশেষ কোন কাজ হয়নি। বিধবাবিবাহের প্রচলন তাঁর ইচ্ছামতো হয়নি। তা না হলেও যখন তিনি তরুণদের মধ্যে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে উৎসাহ দেখতেন, তখন আশায় ও আনন্দে তাঁর মন ভরে যেত।

বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করেন। পাত্রী হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী। বিবাহের তারিখ ১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ। বিদ্যাসাগব তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে চিঠিখানি লেখেন তার মর্ম এই ঃ

'এর আগে তুমি চিঠিতে লিখেছিলে যে নারায়ণ বিধবা-বিবাহ করলে আমাদের আত্মীয়কুটুম্বরা আহার-বিহার পরিত্যাগ করবেন। অতএব নারায়ণের বিবাহ বন্ধ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে নারায়ণ নিজে ইচ্ছা করে এই বিবাহ করেছে, আমার ইচ্ছায় বা অনুরোধে করেনি। যখন শুনলাম, সে বিধবাবিবাহ করবে স্থির করেছে, এবং কন্যাও উপস্থিত হয়েছে, তখন সম্মতি না দিয়ে যদি আমি বাধা দিতাম, তাহলে আমাব পক্ষে সেটা উচিত কাজ হত না। আমি নিজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছি, নিজে উদ্‌যোগ করে অনেক বিধবাবিবাহ দিয়েছি। সে ক্ষেত্রে আমার ছেলে বিধবাবিবাহ না করে যদি কুমারী বিবাহ করত, তাহলে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হতাম। নারায়ণ নিজের ইচ্ছায়

এই বিবাহ করে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে এবং লোকের কাছে আমার পুত্র বলে পরিচয় দিতে পারবে. তার পথও করেছে।

'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম। এজন্মে তার চেয়ে বড় কোন সৎকর্ম করতে পারব বলে মনে হয় না। এই বিধবাবিবাহের জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছি, প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। তার কাছে কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্বমশায়রা আমাদের সঙ্গে আহার-বিহার পরিত্যাগ করবেন, এই ভয়ে যদি আমি আমার পুত্রকে বিধবাবিবাহ করতে না দিতাম, তাহলে আমার চেয়ে বড় নরাধম আর কেউ হত না। বেশি কথা আর কি বলব, নারায়ণ স্বেচ্ছায় এই বিবাহ করাতে আমি নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করছি। মনে রেখ, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নই। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত বা আবশ্যক মনে হবে, তাই করব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে একটুও বিচলিত হব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সঙ্গে যাঁরা সম্পর্ক ত্যাগ করবেন, তাঁরা স্বচ্ছন্দে তা করতে পারেন। তারজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হবে বলে মনে হয় না, এবং আমিও একটুও বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হব না।'

এই চিঠি বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের একটা মূল্যবান দলিল। আমাদের দেশের লোক জানেন, এবং বিদ্যাসাগর নিজেও জানতেন যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ 'সৎকর্ম' বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন। বিদ্যাসাগর দেশাচারের নিতান্ত দাস ছিলেন না বলেই এই মহৎ কর্তব্য পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল তাঁর অসাধারণ সৎসাহস, তাই

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে সমাজের কল্যাণ হবে জেনে তিনি সমাজের ও মানুষের সমস্ত বাধা, সমস্ত চোখরাঙানি উপেক্ষা করে সেই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর্থিক দিক থেকে তারজন্য তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন এবং প্রয়োজন হলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করে বিদ্যাসাগর নির্ভয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য 'বিধবাবিবাহ' প্রচলনের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। মানুষের নীচতা, দীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে বিচলিত ও ব্যথিত করেছে, কিন্তু বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

বহুবিবাহ

আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ অনেককাল থেকে প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করতে পারে, এরকম রীতি শুধু যে হিন্দুদের মধ্যে ছিল তা নয়, পৃথিবীর আরও অনেক মানবজাতির মধ্যে ছিল। কালে কালে এদেশের হিন্দুদের মধ্যে, নানাবিধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে, বহুবিবাহ একটা অন্যায় অধিকারও অভ্যাসে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজের রীতিনীতির প্রভাবও তার জন্য খানিকটা দায়ী। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের এই অধিকারকে কৌলীন্য প্রথা বলা হত। যাঁরা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ তাঁরা কুলীন। কোন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুলীন ব্রাহ্মণপাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতেই হবে, এই ছিল কৌলীন্য প্রথার মূল কথা। সে রকম পাত্রে বিবাহ যদি না হয় তাহলে সেই কন্যার বংশ ব্রাহ্মণসমাজে হেয় হবেন। সমাজে কুলীন অ-বিবাহিত পাত্র ইচ্ছামতো পাওয়া যেত না, এবং তাঁদের সংখ্যাও সীমাহীন ছিল না। সমাজের যে-কোন একটা নির্দিষ্ট বর্ণের মধ্যে অ-বিবাহিত পাত্রের চাহিদা যদি বাড়তে থাকে, তাহলে তা মেটানো কখনই সম্ভব হয় না। তখন যদি সেই সমাজের একই বর্ণের মেয়েদের সেই কুলীনপাত্রদের সঙ্গে বিবাহ দিতেই হবে এমন বাধ্যতা থাকে, তাহলে একজন পাত্রকে একাধিক পাত্রী বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ঠিক এই কারণে বাংলাদেশে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহের মাত্রা খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।

এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে ইতিহাসে অন্য কোন মানবজাতির মধ্যে এরকম ভয়াবহ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

উনিশ শতকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ কোন্ স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে কেউ কেউ অনুসন্ধান করেন। বিদ্যাসাগর মশায় নিজে হুগলি জেলায় অনুসন্ধান করেন। তাতে দেখা যায় যে ৩০।৪০।৫০।৬০ জন করে বিবাহিত স্ত্রী বহু কুলীন ব্রাহ্মণের আছে। শতাধিক স্ত্রী আছে এরকম কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। অধিকাংশ কুলীন স্বামী তাঁদের স্ত্রীদের খবর রাখতেন না, রাখা সম্ভবও ছিল না। বিবাহের পর কুলীন মেয়েরা সাধারণত বাপের বাড়িতেই থাকত। শ্বশুরবাড়ি দেখার সৌভাগ্যও জীবনে তাদের হত কিনা সন্দেহ। কুলীন ব্রাহ্মণ স্বামীটি পালাক্রমে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। তাতেই প্রায় তাঁর বছরের খাওয়া-দাওয়া বিনা পয়সায় চলে যেত। শুধু খেয়ে দেয়েই তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন না, সঙ্গে বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কি থাকত, সেগুলি নানারকম খাদ্যদ্রব্যে ভর্তি করে—যাঁদের স্ত্রীর সংখ্যা বেশি তাঁরা দু'তিন গরুর গাড়ি ভর্তি করে—নিজের পরিবারের ব্যবস্থা করে নিয়ে ফিরে আসতেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, কৌলীন্য প্রথা সমাজে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে (সকলে অবশ্যই নন) নিজ বর্ণের সামাজিক সম্ভ্রম ও মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে, বহুবিবাহকে আর্থিক পেশায় পরিণত করেছিলেন। শেষকালে বহুবিবাহ করাটা বাস্তবিক-ই একটা পেশায় পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের জাতিগত পেশা হল শাস্ত্রচর্চা, বিদ্যাদান ও পৌরোহিত্য। এই কারণে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের কাছে তাঁরা পূজ্য ছিলেন। কৌলীন্যের ফলে

ব্রাহ্মণদের একাংশের মধ্যে চারিত্রিক অবনতির সমস্ত লক্ষণ ফুটে ওঠে। সমাজের কাছে মর্যাদা তাঁরা হারাতে থাকেন।

বহুবিবাহের ফলে সমাজে নানারকমের ব্যভিচার দেখা দিতে থাকে। আরও একটি কুফল ফলতে থাকে, হিন্দুসমাজে অকাল-বিধবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সমাজে বাল্য-বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল বলে বাল-বিধবাদের সংখ্যাই বেশি হয়। এই সঙ্গে আরও একটি ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দেয় —সেটি হল সতীদাহ বা সহমরণ। স্বামীর মৃত্যুর পর সতীস্ত্রী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করে সহমরণ বরণ করতেন। এরকম একটা বীভৎস প্রথাকে তখন ধর্মের মোড়ক দিয়ে মুড়ে পুণ্যকর্ম বলে প্রচার করা হত। ধর্মের রক্ষকরা হিন্দুধর্মের মূর্তিকে যে কতখানি বিকৃত করেছিলেন. তা এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখে বোঝা যায়। সতীদাহের সংখ্যা ও বাল-বিধবাদের সংখ্যা বাংলাদেশে খুব বেশি বেড়েছিল কুৎসিত কৌলীন্য প্রথার জন্য।

সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আইন পাস করিয়ে রামমোহন তা বন্ধ করেছিলেন। বাল-বিধবাদের দুঃখকষ্ট অনুভব করে এবং তার ভয়াবহ সামাজিক ফলাফলের কথা চিন্তা করে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের জন্য আন্দোলন করেন এবং বিধবাবিবাহ আইন পাস করান। বহুবিবাহের সমস্যাও যে গুরুতর সমস্যা একথা বিদ্যাসাগর জানতেন। বিধবাবিবাহ আইন পাস করার জন্য যখন তিনি ভারতসরকারের কাছে আবেদন করেন, তার কয়েক দিনের মধ্যে বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আর একটি আবেদনপত্র পাঠান (২৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫)। তার আগে যেমন বিধবাবিবাহ নিয়ে সমাজে আলোচনা চলছিল, বহুবিবাহ নিয়েও তেমনি আলোচনা ও

আন্দোলন চলছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র (প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাই) সামাজিক উন্নতির জন্য একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের আগে বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন। অক্ষয় কুমার দত্ত ও আরও অনেকে বহুবিবাহের দোষ ও কুফল দেখিয়ে তখনকার সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। বোঝা যায়, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দেশের জনমত গড়ার জন্য যে আন্দোলন চলছিল, বিদ্যাসাগর তাতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ সালের পর দেখা যায় যে ১৮৬৩ সালে দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ মল্লিক, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক, এবং আরও প্রায় ১৫৮০ জন হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভাবতসরকারের কাছে বহুবিবাহ-নিবারণ আইন পাস করার জন্য আবেদন করেন। ১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় ও অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য বাংলার ছোটলাটের কাছে আবেদন করেন। ছোটলাট তখন সিসিল বিডন। তিনি ১৯ মার্চ তারিখে তাঁদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকে পাঠান। ছোটলাটের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যান তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ভূ-কৈলাসের (খিদিরপুর) রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজেন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ সরকার, প্যারীচরণ সরকার, দুর্গাচরণ লাহা, রমানাথ লাহা, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ছোটলাট বিডন তাঁদের বলেন যে ভারতসরকার এই আইন পাস করতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ হিন্দুদের প্রচণ্ড আপত্তির কথা ভেবে। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত মত হল, এই ধরনের নিন্দনীয় কুপ্রথা আইন পাস করিয়ে

বন্ধ করা উচিত। এ বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং ভারত সরকারের কাছে লিখবেন।

বাংলা-সরকার এ বিষয়ে ভারতসরকারের কাছে একটি পত্র লেখেন (৫ এপ্রিল, ১৮৬৬)। তাতে বাংলাদেশে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করা হয় এবং আইন পাসের পক্ষে যুক্তিও দেখানো হয়। ভারত সরকার এই পত্রের উত্তরে (৮ আগস্ট ১৮৬৬) জানিয়ে দেন যে আবেদন মঞ্জুর করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ দেখিয়ে তাঁরা লেখেন ঃ 'বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বহুবিবাহ সমর্থন করেন না, একথা আমরা জানি। তাঁদের মতামতের প্রতি আমাদের সহানুভূতিও আছে। কিন্তু তা থাকলেও তাঁদের মতামত অনুযায়ী কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ হিন্দু জনসাধারণ, এমন কি শিক্ষিতদের মধ্যেও বেশিরভাগ লোক, রাষ্ট্রীয় আইন পাস করে বহুবিবাহ বন্ধ করার বিরোধী। বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত আবেদনপত্র এসেছে, সেগুলি বিচার করে আমাদের একথাই মনে হয়েছে। তাছাড়া এসম্বন্ধে আরও একটি কথা ভাববার আছে। বহুবিবাহ হিন্দুদের একটি সামাজিক প্রথা, হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি আইন পাস করে তা বন্ধ করি, তাহলে বিধর্মী শাসকরা হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন বলে হিন্দুরা প্রতিবাদ করতে পারেন। দেশের মধ্যে অকারণে এই অসন্তোষ সৃষ্টি করতে আমরা চাই না।'

ভারত সরকারের এই উত্তর পাবার পর বাংলা-সরকার বহুবিবাহ সম্বন্ধে সামাজিক অনুসন্ধানের জন্য একটি 'তদন্ত

কমিটি' নিয়োগ করেন। এই তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন সাতজন—দু'জন ইংরেজ, পাঁচজন বাঙালী। সি.পি. হব হাউস ও এইচ্. টি. প্রিন্সেপ—এই দু'জন হলেন ইংরেজ সদস্য। বাঙালীরা হলেন সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন ১৮৬৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। তিনজন বাঙালী সদস্য—রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র—আইন পাস করে বহুবিবাহ বন্ধ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে দেশে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে বহুবিবাহ এমনিতেই ধীরে ধীরে কমে যাবে, শিক্ষিত মানুষ একবিবাহের পক্ষপাতী হবে। তারজন্য এখন-ই আইন পাস করে বহুবিবাহ জোর করে বন্ধ করা অর্থহীন। তাতে সমাজে শুধু গোলমালই হবে, আর কিছু হবে না। বাংলা সরকার এঁদের মত অবশ্য সমর্থন করেন নি। বিদ্যাসাগর মশায় এই মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন আইন পাস করে বহুবিবাহ বন্ধ করার পক্ষে। কিন্তু তাঁর মতামতে কোন কাজ হয় নি।

বহুবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও বিদ্যাসাগর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেননি। বিধবাবিবাহের মতো বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তিনি পুস্তিকা লিখে প্রচার করেছেন। প্রথম পুস্তিকা ১৮৭১ সালে, দ্বিতীয় পুস্তিকা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে তার পরে আলোচনা ও আন্দোলন থামেনি। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার আগে, 'হিন্দু কোড বিল' পাস না হওয়া পর্যন্ত, হিন্দু-সমাজে বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ ছিল না। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুগামীদের আন্দোলনের প্রায় একশো বছর পরে

বহুবিবাহ হিন্দুসমাজে বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। স্বাধীন ভারত-সরকার বিদ্যাসাগরের আশা পূর্ণ করেছেন। পরাধীন নারীর কল্যাণের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর দীর্ঘ কর্ম-জীবনে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ ও একবিবাহের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রামের আশানুরূপ ফলাফল তিনি নিজের জীবনে দেখে যেতে পারেননি। তবু তাঁর মনে আশা ছিল, একদিন তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। আজ তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। বাংলার ও ভারতের নারী সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ পুরুষের মতো মুক্তি পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্য

জল পড়ে,
পাতা নড়ে।

রবীন্দ্রনাথ তখন 'কর. খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটিয়ে সবেমাত্র তীরের খোঁজ পেয়েছেন। সেদিন যখন তিনি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ থেকে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পড়েন, তখন তাঁর শিশুমনে একটা অপূর্ব অনুভূতি জাগে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে আদিকবির সম্মান দিয়েছেন। সাহিত্যের সমালোচক যাঁরা তাঁরা অবশ্য তা দেননি। তাঁরা বলেন, বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। তা ছাড়া এমন কিছু তিনি রচনা করেননি যা প্রকৃত 'সাহিত্য' বলে গণ্য হতে পারে। সমালোচকরা যে বাঁধাধরা মাপাজোকা মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্যের বিচার করেন

তাতে বিদ্যাসাগরকে পাঠ্যপুস্তকের লেখক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু 'সাহিত্য' রচনা করতে হলে আগে তার উপযুক্ত 'ভাষা' তৈরি করা দরকার। বিদ্যাসাগরের আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যভাষার যে বিকাশ হয়েছিল তা দিয়ে ঠিক সাহিত্য রচনা করা যায় না। বিদ্যাসাগর বাংলাভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে বাংলাভাষার 'আর্কিটেক্ট' বা স্থপতি বলা যায়। বাংলা-ভাষার কাঠামটাকে অনেকদূর পর্যন্ত কল্পনা করে তাঁকে গড়তে হয়েছে। বাধ্য হয়ে তাঁকে তাই স্কুলপাঠ্যবই, অনুবাদ ও ভাবানুগামী রচনা বেশি লিখতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষাকে যিনি শিশুর অস্ফুট শব্দধ্বনি থেকে সুবিন্যস্ত সংহত সাধুভাষায় পরিণত করেছিলেন, তাঁর প্রতিভার সমাদর রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবানই করতে পারেন।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্টউইলিয়াম কলেজের শেরেস্তাদার নিযুক্ত হন তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহজপাঠ্য বই বাংলা গদ্যভাষায় লিখতে বলেন। বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব চরিত' রচনা করেন। বইখানি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়নি। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে গদ্যভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা এই ঃ

"একদিবস মহর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূ-মণ্ডলে জন্ম লইয়াছে, এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন···।"

এই গদ্যভাষা পড়লে মনে হয় না যে উনিশ শতকের চল্লিশের গোড়ার দিকের রচনা। বাক্যগঠন ও শব্দবিন্যাসের

এই রীতি কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সাধুভাষার আদর্শ রীতি ছিল। 'বাসুদেব চরিতে'র পর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) থেকে 'ভূগোলখগোল বর্ণনম্' (১৮৯২) পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের লেখা প্রায় ২৭ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বেনামীতে লেখা আরও প্রায় পাঁচখানি বই তাঁর আছে শোনা যায়। তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত ও বাংলা বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১২ খানি। এইগুলি অধিকাংশই হয় কোন মূলগ্রন্থের অনুবাদ অথবা পাঠ্যবই। ভাব অনুসরণে লেখা হলেও লেখকের নিজস্ব কোন সৃষ্টিশক্তি আছে কিনা তা তাঁর রচনার গুণ থেকেই প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' পড়লে বোঝা যায় যে তাঁর নিজস্ব রচনা শক্তি যথেষ্ট ছিল এবং ইচ্ছা করলে মৌলিক রচনাও তিনি অনেক লিখে যেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি বাংলাভাষার কারিগরের কাজই করেছেন বেশি। বাংলাভাষায় বিদ্যাসাগরের দান কি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিতে' যা লিখেছেন তার মর্ম এই ঃ

'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তার আগে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাগদ্যকে সুন্দর শিল্পের রূপ দেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নয়, তার মধ্যে যেন-তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরে দিলেই যে কর্তব্য করা হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দিয়ে তা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তা সরল করে, সুন্দর করে এবং সুশৃঙ্খল করে প্রকাশ করতে হবে। আজকের দিনে এই কাজটিকে খুব একটা কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কিন্তু মানুষের বিকাশের জন্য যেমন সমাজবদ্ধ হওয়া

প্রয়োজন, তেমনি সাহিত্যের বিকাশের জন্য ভাষাকে শিল্পবদ্ধ করে সুন্দর ও সংযত করা প্রয়োজন। যুদ্ধ করতে হলে অ-সংযত জনতাকে দিয়ে হয় না, সংযত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করে, তাকে নির্দিষ্ট পথে চালানো যায় না। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার অসংযত জনতাকে সংযত ও সু-বিন্যস্ত করে তার গতি সহজ করেছিলেন। ভাষাকে সাহিত্য রচনার উপযোগী করেছিলেন। এখন সেই ভাষার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব প্রকাশেব কঠিন লড়াইয়ে জয়ী হতে পারেন, অনেক নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সৈন্যদল প্রথম গঠন কবেছিলেন, যুদ্ধজয়ের গৌরব সর্বপ্রথম তাঁব প্রাপ্য। তিনি হলেন বিদ্যাসাগর।

'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষাকে আগেকার অনাবশ্যক সমাসের আড়ম্বর থেকে মুক্ত করেন। বাংলা পদগুলিব মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করেন। তার ফলে বাংলাগদ্য সকল রকম ব্যবহারের উপযোগী হয়। বাংলাগদ্যকে তিনি সুন্দর ও শোভন করারও চেষ্টা করেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি ও সুরের সামঞ্জস্য স্থাপন করে তিনি তার গতি সাবলীল করেন।'

বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগবের দান কি এবং কতখানি তার ব্যাখ্যা এমনভাবে আর কেউ কবেন নি। এত বড় সম্মানও কোন সাহিত্য-সমালোচক বিদ্যাসাগরকে দেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ শিল্পীর পক্ষেই বিদ্যা-সাগরেব সাহিত্যিক দানেব গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য, "তিনি বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী।"

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে গল্প

গল্প অবশ্য গল্প। গল্প বলতে আমাদের ধারণা, যা সত্য নয় তাই গল্প। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। যাঁরা গল্প লেখেন, যাঁরা গল্প বলেন, এবং যাঁরা গল্প পড়েন ও শোনেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে কোন একটা সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্প রচনা করা হয়, তবে তারমধ্যে গল্পকার রঙের প্রলেপ দেন বলেই সেটা গল্প হয়। সেই গল্প আমাদের পড়তে ও শুনতেও ভাল লাগে। কোন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে পাড়ার লোক, সমাজের লোক, শত্রুমিত্র সকলে যখন গল্প রচনা করে, তখন তার মধ্যে সত্য খানিকটা থাকে, আর খানিকটা থাকে কল্পনার রং। সমাজের সাধারণ রাম-শ্যাম-যদুদের নিয়ে কেউ গল্প রচনা করে না। গল্প তাদের নিয়ে মুখে মুখে রচিত হতে থাকে যাঁরা সাধারণের বাইরে বেশ একটু অসাধারণ। সাধারণ ছিঁচ্‌কে চোর যারা তাদের গল্প কেউ বলে না, কিন্তু বড় বড় ডাকাত-দের সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। তেমনি সমাজে অ-সাধারণ ব্যক্তি যাঁরা, বিচিত্র কর্মজীবনে যাঁদের চরিত্রের নানারঙের রামধনুর মতো বিকাশ হয়, কোলাহল ও ভিড় ঠেলে ঠেলে যাঁরা জীবনের পথে এগিয়ে যান, গল্প তাঁদের নিয়েই লোকের মুখে মুখে রচিত হতে থাকে। বিদ্যাসাগর একজন অ-সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প লোকমুখে রচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের অনেক কাহিনী আজ বাংলার ঘরে ঘরে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এইসব গল্পের ভিতর দিয়ে আসল বিদ্যাসাগরকে বোঝা যায়।

পিতামাতার প্রতি বিদ্যাসাগরের ভক্তি বাংলাদেশে প্রবাদের মতো জনপ্রিয়। পিতা ঠাকুরদাস খুব সু-দর্শন ছিলেন না এবং প্রকৃতিও তাঁর একটু রুক্ষধরণের ছিল। মা ভগবতী দেবী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল, কিন্তু তাঁর মর্যাদাবোধ ছিল খুব প্রখর। এতটুকু আঘাত বা অপমান তিনি সহ্য করতে পারতেন না। দম্ভ তাঁর ছিল না, কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমন একটা সরল স্বাতন্ত্র্য ছিল যা বাইরে থেকে দেখলে দম্ভের মতো মনে হত। বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের চরিত্রের কোমলতা, মধুরতা এবং তীব্র স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধ পেয়েছিলেন। পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন নিরহঙ্কার ও নিঃস্বার্থবুদ্ধি। পিতামাতার স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য ছিল বলে মধ্যে মধ্যে দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে তাঁদের মন কষাকষি হত। তবে তা বেশিক্ষণ টিকত না। ঠাকুরদাসের বাইরেটা রুক্ষ হলেও, ভিতরটা সহজ সরল ছিল। ভগবতী দেবীর বাইরেটা ছিল দেবীমূর্তির মতো শান্ত ও প্রসন্ন, ভেতরটা ছিল তেজস্বী বিদ্রোহীর মতো। ঠাকুরদাসের সামান্য কথাতে তিনি ভয়ানক অভিমান করতেন। ঠাকুরদাস যখন বুঝতেন যে ভগবতী দেবী অপ্রসন্ন, তখন তাঁকে প্রসন্ন করতে তাঁর বিশেষ কষ্ট করতে হত না। ভগবতী দেবী লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। বড় মাছ দেখলে তাঁর রাগ অভিমান সব একমুহূর্তে উড়ে যেত। বড় মাছ পেলে তিনি নিজে বঁটি নিয়ে কুটতেন এবং নিজে রান্না করে সকলকে খাওয়াতেন। তাঁর রাগ ভাঙাবার এই কলকাঠিটি ঠাকুরদাসের জানা ছিল। গৃহিণীর রাগের লক্ষণ দেখলেই তিনি সব কাজ ফেলে হাটে অথবা জেলেদের কাছে চলে যেতেন এবং যে-ভাবেই হোক একটি

বড় মাছ জোগাড় করে গৃহিণীর ঘরের সামনে ফেলে দিয়ে বলতেন, 'এই ছাখো, পুকুরের সবচেয়ে বড় মাছটা তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।' কোথায় তখন রাগ আর অভিমান! প্রসন্ন মনে একগাল হেসে ভগবতী দেবী বঁটি নিয়ে মাছ কুটতে বসতেন। ঠাকুরদাস সেই ফাঁকে একটু মজা করতেও ছাড়তেন না। ভগবতী দেবী মাছ ধরতে গেলে বলতেন, 'খবরদার! মাছে হাত দিও না বলছি। তুমি যেমন রাগ করে শুয়ে আছ, শুয়ে থাক, জগাই কুটবে।' এতে ওষুধের দ্বিগুণ মাত্রা কাজ হত। ভগবতী দেবী হাসতে হাসতে মাছ হাতে করে চলে যেতেন। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে বিদ্যাসাগর ও তাঁর ছোট ভাইদের বউরা ঠাকুরদাস-ভগবতী দেবীর এই দাম্পত্য অভিনয় উপভোগ করতেন।

সাংসারিক জীবনে ভগবতী দেবীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল দীন-দরিদ্র অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করা। পরিবারের সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও তিনি অনেক বেলা পর্যন্ত না খেয়ে অপেক্ষা করতেন। বহুদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যেত। যদি কোন দীন-দুঃখী কেউ অ-ভুক্ত অবস্থায় আসে, যদি কোন অতিথি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, তারই জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন। যত অ-বেলাতেই হোক, কোন অভুক্ত লোক এলে তিনি তাকে স্নান করিয়ে যত্ন করে খাওয়াতেন। অতিথি সেবার তো কথাই নেই। সংসারে এইভাবে তাঁর দিন কাটত। শুধু ঘরে নয়, ঘরের বাইরে পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিতেন। যাঁদের দুঃখের সংসার তাঁদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা। এরকম মায়ের ছেলে যে বাংলাদেশে শুধু বিদ্যার সাগর বলে নয়, দয়ার সাগর বলেও

পরিচিত হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একবার বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ; 'বাংলাদেশের মায়েদের মতো কোমল আপনার অন্তঃকরণ, প্রাচীনকালের মুনিঋষিদের মতো আপনার জ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি, একালের ইংরেজদের মতো আপনার অ-ফুরন্ত কর্মশক্তি।' বাস্তবিক নিজেব মায়ের মতো, এবং বাংলাদেশের মায়েদের মতো, কোমল অন্তঃকরণ ছিল বিদ্যাসাগরের।

একবার একজন ইংরেজ অফিসার হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগবের গ্রামের বাড়িতে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সাহেব ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কত টাকা আছে?' সলজ্জ কণ্ঠে ভগবতী দেবী মিষ্টি করে বলেন, 'আমার অনেক টাকা, চার ঘড়া টাকা আছে।' পাশে ছিলেন বিদ্যাসাগর ও তাঁর তিনটি ছোট ভাই। তাঁদের দিকে দেখিয়ে ভগবতী দেবী বলেন, 'এই যে আমার চার ঘড়া ধন।' ছেলেদের সম্বন্ধে ভগবতী দেবী খুব গর্ববোধ করতেন। হ্যারিসন সাহেব তাঁর উত্তর শুনে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

গত শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ইউরোপ থেকে অনেক নামকরা চিত্রকর বাংলাদেশে কলকাতা শহরে আসেন। শহরের রাজা-মহারাজা বড়লোকরা তাঁদের বাড়িতে ডেকে পোর্ট্রেট ছবি আঁকাতেন। তখন ফটোগ্রাফির প্রচলন ছিল না। বড় বড় ক্যানভাসের উপর চিত্রকররা তেল রঙে পোর্ট্রেট আঁকতেন। যাঁর পোর্ট্রেট আঁকা হত, তাঁকে শিল্পীর সামনে বসে থাকতে হত। শিল্পী তাঁকে দেখে দেখে ছবি আঁকতেন। হাডসন নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর কলকাতায় পাইক-পাড়ার রাজবাড়িতে একবার এইরকম ছবি আঁকার জন্য নিযুক্ত

হন। পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে বিদ্যাসাগর মশায়ের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রাজপরিবারের লোকজন তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। চিত্রকর হাডসনকে দেখে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা হয় তাঁকে দিয়ে তাঁর পিতামাতার দুটি ছবি আঁকিয়ে নেন। হাডসন সানন্দে রাজি হন। প্রথমে হাডসন বিদ্যাসাগরের নিজের ছবি আঁকতে চান। বিদ্যাসাগরের তখন পূর্ণ যৌবন। সাধারণত বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত ছবি আমরা দেখতে পাই, মনে হয় সেগুলির মধ্যে যেন কোন রসকষ নেই। কাঠের মতো কঠিন চেহারা। কিন্তু যৌবনে তাঁর চেহারা যে কত সুন্দর ছিল, তা হাডসনের আঁকা ছবি দেখে বোঝা যায় (বইয়ের গোড়াতে এই ছবি ছাপা হয়েছে)। বিদ্যাসাগর রাজি হবেন না, হাডসনও ছাড়বেন না। অবশেষে হাডসনের কথাই রইল, তাঁর ছবি আকা হল।

ছবি আকবার জন্য পিতামাতাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতায় আসার পর মাকে বললেন, 'মা, পাইক-পাড়া রাজবাড়িতে একজন খুব ভাল ইংরেজ পোটো (আমাদের দেশে যারা ছবি আঁকত তাদের 'পটুয়া' বলা হত, তাই থেকে 'পোটো') এসেছে, ভাবছি তাঁকে দিয়ে তোমার একখানা ছবি আকাব।'

মা –'দূর পাগল, আমার আবার ছবি কিরে।'

বিদ্যাসাগর—'ছবি কি আর তোমার জন্যে আঁকাব? আমার জন্যে আকাব। যখন যেখানে থাকি তুমি কাছে না থাকলেও ছবিটাতো থাকবে।'

মা—'তবে তোর যা-ইচ্ছে তাই কর।'

বিদ্যাসাগর—'তাহলে কি সাহেবকে আমাদের বাড়িতে ডেকে আনব, না তুমি আমার সঙ্গে তাঁর ওখানে যাবে?'

মা—'সাহেব পোটোর সামনে বসে আমি বাপু ছবি আঁকাতে পারব না।'

বিদ্যাসাগর—'সাহেব খুব ভাল লোক, আমারও একখানা ছবি এঁকেছে। ওঁর সামনে বসলে তোমার কোন দোষ হবে না।'

মা—'তাই যদি হয় বাবা তাহলে আমাদের বাড়িতে এনেই কর, আমি কোথাও যেতে পারব না।'

বিদ্যাসাগর—'আঁকার জিনিসপত্তর আমাদের এখানে নিয়ে আসতে তাঁর অসুবিধে হবে। তারচেয়ে তুমি বরং আমার সঙ্গে সাহেবের বাড়িতে চল।'

বিদ্যাসাগরের অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভগবতী দেবী তাই গিয়েছিলেন। হাডসন সাহেব শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের পিতামাতার একাধিক ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। দু'খানি ছবি কলকাতার জন্য ছিল, তাছাড়া কর্মাটাঁড় ও ফরাশডাঙ্গার জন্য অন্য ছবি ছিল। বিদ্যাসাগর যখন যেখানে থাকতেন সেখানে পিতামাতার এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে তবে জলগ্রহণ করতেন। এ তাঁর প্রতিদিনের কাজ ছিল। যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা এ কথা লিখে গিয়েছেন।

মায়ের প্রভাব বিদ্যাসাগরের জীবনে আর একদিক থেকেও ছিল, সেদিক হল ধর্মবিশ্বাসের দিক। মূর্তি গড়ে দেবদেবীর পুজোর কথা উঠলে ভগবতী দেবী নাকি বলতেন, 'যে দেবতা আমি নিজের হাতে গড়লাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়ে পুজো করে কি ধর্ম হয়?' এই কথা থেকে বোঝা যায়, ভগবতী দেবীর ধর্মবিশ্বাস, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা কত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরেরও ঠিক তাঁর

মায়ের মতো পরিষ্কার ধারণা ছিল। তার মধ্যে কোন বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। কখনও তিনি লোক দেখিয়ে নিজের ধর্মমত জাহির করতে চাননি। ধর্মের আড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। অথচ ধর্ম মানতেন, ঈশ্বরও মানতেন।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির যে গল্পটি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেটি হল, সাঁতার দিয়ে দামোদর নদ পার হয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার গল্প। একবার ভগবতী দেবী তাঁকে বিশেষ কাজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্টউইলিয়ম কলেজে কাজ করেন। কলেজ থেকে ছুটি চেয়ে পাননি। ছুটি না পাওয়াতে কলেজের সেক্রেটাবি মার্শাল সাহেবকে তিনি বলেন, 'ছুটি যদি মঞ্জুর না করেন তাহলে চাকরি ছেড়ে দিয়েই আমাকে যেতে হবে এবং আজকেই যেতে হবে।' মার্শাল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন? আজকেই যেতে হবে কেন?' বিদ্যাসাগর বলেন, 'আমার মা ডেকেছেন। কাজেই যত বাধাই থাক তাঁর আদেশ আমি কিছুতেই অমান্য করতে পারব না। যেতে আমাকে হবেই।' সাহেব বাঙালী পণ্ডিতের মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন এবং একটি কথাও না বলে ছুটি মঞ্জুর করলেন। তখন আর সময় নেই। পরদিনই তাঁকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে। ছুটি পেয়ে বাসায় ফিরে ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পায়ে-হাঁটা পথে বীরসিংহ যাত্রা করলেন।

আষাঢ় মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যেই বিদ্যাসাগর চলতে আরম্ভ করলেন। এমনিতেই তিনি বেশ

জোরে পথ চলতে পারেন, তারউপর তাড়া ছিল বলে এত দ্রুত তিনি পথ চলছিলেন যে মধ্যে মধ্যে ভৃত্য শ্রীরাম দৌড়েও তাঁর নাগাল পাচ্ছিল না। সন্ধ্যার একটু পরে কৃষ্ণরামপুর গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন, স্থির করলেন সেখানকার একটি দোকানে রাত কাটাবেন। কাছাকাছি গ্রামে ভৃত্য শ্রীরামের বাড়ি, তাকে যেতে বললেন। শ্রীরাম গেল না। এখনও প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ মাইল পথ বাকী। বিদ্যাসাগরকে একা ছেড়ে দিয়ে শ্রীরাম গেল না। পরদিন সকাল থেকে বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামের আবার পথচলা আরম্ভ হল। দামোদরের তীরে পৌঁছলেন। বর্ষাকালে দামোদরের ভয়াবহ রূপ হয়। যেমন তার খরস্রোত, তেমনি ঘূর্ণি ও ঢেউ। পারঘাটে নৌকাও নেই, ওপারে চলে গিয়েছে। নৌকা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে পার হতে হলে বেশ কয়েকঘণ্টা সময় নষ্ট হবে। বীরসিংহে পৌঁছতে অনেক দেরী হবে। মা ব্যাকুল হবেন, ঘরে-বাইরে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াবেন। বিদ্যাসাগর স্থির করলেন, খেয়া নৌকায় পার না হয়ে, নিজেই তিনি সাঁতরে দামোদর পার হবেন। তাতে তাঁর জীবন বিপন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ভৃত্য শ্রীরাম কি করেছিল কে জানে। মনে হয় না সে প্রভুর সঙ্গে দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিল। এপারে দাঁড়িয়েই বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিক কীর্তির সাক্ষী হয়েছিল সে। দামোদর পার হয়ে, বাকী পথ পায়ে হেঁটে বিদ্যাসাগর বীরসিংহে পৌঁছে মাকে প্রণাম করে যখন তাঁর পথ চলার কথা বললেন, তখন পুত্রকে জড়িয়ে ধরে গর্বে ও আনন্দে ভগবতী দেবীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিদ্যাসাগরের হাঁটার গল্প আরও অনেক আছে। ছেলে-

বেলায় পিতা ও গুরুমশায়ের সঙ্গে হেঁটে কিভাবে তিনি বীরসিংহ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। তাঁর হাঁটা সম্বন্ধে আর দুটি মাত্র গল্প এখানে বলব। একটি গল্প তাঁর দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলে গেছেন, আর একটি গল্প তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। সমাজপতি বলেছেনঃ "একদিন কর্মাটাঁড়ে আমি, দাদামশায় (বিদ্যাসাগর) এবং আরও কয়েকজন সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। পথে বেরিয়ে আমি বললাম, 'দাদু আজ আপনার হাঁটা দেখব। দেখি কেমন আপনি আমাদের সঙ্গে হেঁটে পাল্লা দিতেন পাবেন।' দাদামশায় আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তাই নাকি? বেশ ভাল কথা, তাই হবে। আমিও দেখব তোদের দৌড় কদ্দূর।' তারপর আমাদের হাঁটা আরম্ভ হল। অল্পক্ষণের মধ্যে সঙ্গীরা হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে পড়ল। আমি শুধু সঙ্গে চলতে লাগলাম, অবশ্য খানিকটা করে দৌড়ে নিয়ে আমাকে ধরতে হচ্ছিল। কতক্ষণ আর পারা যায়! আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লাম। দাদামশায় যেমন চলছিলেন তেমনি চলতে থাকলেন। চটির চট্ চট্ শব্দ কানে আসতে লাগল, তারপর শব্দ মিলিয়ে গেল। দাদামশায়েব মাথাটা অনেকদূরে একটা কালো বিন্দুর মতো মনে হতে লাগল। অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলাম। বিন্দুটা ক্রমে ছোট থেকে বড় হতে লাগল, একটা মানুযের চেহারা দেখা গেল। দেখলাম দাদামশায় ফিরে আসছেন, ঠিক এক ভাবে হন্ হন্ করে। আমি তখনও হাঁ করে দম নিচ্ছি। কাছাকাছি এসে দাদামশায় বললেন, "কিরে, হারাবি?"

পুত্র নারায়ণচন্দ্র বলেছেনঃ "বাবা যখন সংস্কৃত কলেজে চাকরি করেন, তখন একবার বিশেষ জরুরী কাজে একদিনের

মধ্যে তাঁকে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসতে হয়। যাত্রা করার উদ্‌যোগ করছেন, এমন সময় গ্রামেব মদন মণ্ডল নামে একজন পাইক বাবাকে এসে বলে যে সেও তাঁর সঙ্গে কলকাতায় যাবে। তার কথা শুনে বাবা বলেন, 'তুমি যে যাবে বলছ, আমার সঙ্গে কি হাঁটতে পারবে?' মদন ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।' আট দশ মাইল হাঁটার পরেও বাবার চলার গতি একটুও কমল না। ওদিকে মদন আর তাল রাখতে পারছিল না, সে পিছিয়ে পড়ল। পাইক-বরকন্দাজের হাতে বড় লাঠি থাকে। বাবা যখন বেশ দূরে গেলেন তখন মদন 'হা-রা-রা' করে লাঠি ঘুরিয়ে দু'চার পাক খেয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে ধরে ফেলল। কিন্তু এইভাবে লাঠি ঘুরিয়ে পাক খেয়ে ধরে ফেলা বেশিক্ষণ চলল না। মাইল কুড়ি-পঁচিশ চলবার পর মদনের হাড়গোড় প্রায় ভেঙে পড়ল, লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে চলার মতো অবস্থা হল তার। বাবার চটির বেগ কিন্তু ঠিক রইল। মদন নিরুপায় হয়ে বাবাকে বলল, 'শোন, একটা কথা বলি, আজ আর কলকাতায় গিয়ে দরকার নেই। কাছে একটা চটি (সরাই-খানা) আছে, সেখানে থাকা যাক।' বাবা হেসে বললেন, 'বলেছিলে যে পারবে? তুমি তাহলে চটিতে থাক, আমি যাই। আমাকে যেতেই হবে।' মদন সেখানে চটিতে রইল, বাবা একলা কলকাতায় চলে এলেন।"

শুধু যে চটি পায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর অবিরাম পথ চলতে পারতেন তা নয়, পথে অসহায় পথিকদেরও যথাসাধ্য পথ চলতে সাহায্য করতেন। পথে যদি কেউ মোট বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখতেন, তাহলে তার কাছ থেকে সেই মোট নিজে কাঁধে নিয়ে পথ চলতেন এবং কিছুক্ষণ পরে

আবার তার মোট তাকে ফিরিয়ে দিতেন। একবার বীরসিংহ থেকে কলকাতায় হেঁটে আসাব সময় পথে দেখতে পান, একজন অতিবৃদ্ধ চাষী মাথায় বোঝা নিয়ে নুয়ে পড়েছে, এক পাও আর পথ চলতে পারছে না। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল যে সঙ্গে তার একটি তরুণ বয়সের ছেলে ছিল, সে বোঝাটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে পালিয়েছে। বৃদ্ধ পিতার প্রতি তরুণ বয়সের পুত্রেব আচরণের কথা শুনে বিদ্যাসাগর চোখের জল সামলাতে পারলেন না ; কেঁদে ফেললেন। বৃদ্ধ চাষী তাঁর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইল। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, তাব গ্রাম আর কতদূর ? বৃদ্ধ বলল, বেশি দূর নয়, পাঁচ-ছয় মাইল। বোঝাটি কাঁধে নিয়ে বিদ্যাসাগর এক হাতে বৃদ্ধকে ধরে পথ চলতে লাগলেন এবং গ্রাম পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসে কলকাতার পথ ধবলেন।

সাদা ফতুয়া চাদর ও দেশী চটি, এই ছিল বিদ্যাসাগরের পোষাক, একেবারে এদেশের সাদাসিধে গ্রাম্য মানুষের মতো। পথে-ঘাটে দেখলে কেউ তাঁকে বিদ্যাসাগর বলে চিনতে পারত না। তাব উপর তিনি যে একজন খুব বলিষ্ঠ সুশ্রী সুপুরুষ ছিলেন, তাও নয়। যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তাঁরা সকলেই প্রায় তাঁকে প্রথম দেখে সাধারণ লোক মনে করতেন। এ সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প আছে।

একবার মেদিনীপুর থেকে চারজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে আসেন। সকালে তাঁরা বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে দেখা করতে যান। বিদ্যাসাগর তখন বাগান তদারক করছিলেন এবং নিড়ানি দিয়ে ঘাস নিড়োচ্ছিলেন। বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে দর্শনপ্রার্থী ভদ্রলোকরা বিদ্যাসাগরকে বাগানের মালি মনে করে জিজ্ঞাসা

করেন, 'ওহে, শুনতে পাচ্ছ? এটা কি বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি?'

বিদ্যাসাগর—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোকরা—'বাবু বাড়ি আছেন কি?'

বিদ্যাসাগর—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন।'

ভদ্রলোকরা—'তাঁকে খবর দাও, মেদিনীপুর থেকে আমরা দেখা করতে এসেছি।'

বিদ্যাসাগর—'আজ্ঞে ভেতরে আসুন, ঘরে বসুন, খবর দিচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর, বাগানের কাজ সেরে, বিদ্যাসাগর ঘরের ভেতরে চলে যান। তারপর আরও কিছুক্ষণ পর বাইরের ঘরে ঢুকে ভদ্রলোকদের সামনে এসে দাঁড়ান। কোন কথা বলার আগেই ভদ্রলোকরা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে বাপু, এতক্ষণ ধরে আমাদের বসিয়ে রেখেছ। কখন তোমাকে বলেছি বিদ্যাসাগর মশায়কে খবর দিতে, তার কি হল?'

বিদ্যাসাগর—'আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর দিয়েছি, তিনি এসেছেন।'

ভদ্রলোকরা—'এসেছেন? কোথায় এসেছেন? আবার রসিকতা হচ্ছে?'

বিদ্যাসাগর—'আজ্ঞে না; ভদ্রলোকদের সঙ্গে রসিকতা করতে পারি? তিনি সত্যি এসেছেন। আজ্ঞে আমারই নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'

ভদ্রলোকদের তামাক খেতে দেওয়া হয়েছিল, চারজনই বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। হঠাৎ কথাটা শুনে হাত থেকে হুঁকো ফেলে দিয়ে চারজনই ফরাস থেকে লাফিয়ে উঠলেন। 'হ্যাঁ,

কি বলছেন কি, কি বলছেন কি, বিদ্যাসাগর ! বিদ্যাসাগর !' তোতলার মতো বলতে বলতে তাঁরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েও বিড় বিড় করতে লাগলেন—'এই বিদ্যাসাগর ! হ্যাঁ, তাই তো হবে, তা না হলে আর বিদ্যা-সাগর !'

একবার বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে বিদ্যাসাগর হুগলি জেলার এক গ্রামে যান। তখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের রাখাল বালকেরা পর্যন্ত মাঠে মাঠে তাঁর নামে লেখা গান গেয়ে বেড়াত। মেয়েদের কাছে ছিলেন তিনি সবচেয়ে বেশি দর্শনীয় পুরুষ। যিনি বিধবা-বিবাহের জন্য, স্ত্রী-শিক্ষার জন্য, সমাজ তোলপাড় করেছেন তাঁকে দেখবার আগ্রহ গ্রামের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সকলেরই সমানভাবে থাকা উচিত। বিদ্যাসাগর গ্রামের স্কুল দেখতে যাবেন, এই বার্তা লোকের মুখে মুখে হাটে-মাঠে-ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দ্রুত রটে গেল। বেলা দশটা বাজল, সময় হল নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যাসাগরের আসার। গ্রামের পথে ছেলে-বুড়োদের, গ্রামের ঘরে ও বাড়িতে মেয়েদের ভিড় জমল। মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে ভিড় করে দাঁড়াল, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইল। কখন বিদ্যাসাগর আসবেন। দশটা থেকে বেলা বারটা বেজে গেল। দুপুরের রোদ মাথায় করে সকলে পথের দিকে চেয়ে রইল—কখন বিদ্যাসাগর আসবেন ! স্কুলের ছাত্ররা যে যার ক্লাসে স্থির হয়ে চুপ করে বসে আছে, প্রত্যেকের বুক দুর-দুর করছে। প্রত্যেকে ভাবছে, যদি বিদ্যাসাগর তার ক্লাসে ঢুকে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন। শিক্ষকরাও স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাসাগরের প্রতীক্ষায়, ভয়ে

তাঁদেরও বুক টিপটিপ করছে। এমন সময় হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল—বিদ্যাসাগর আসছেন। একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বিদ্যাসাগরকে অনেকেই দেখতে পাচ্ছে না। এক বৃদ্ধা মহিলা অনেকদূর থেকে বিদ্যাসাগরকে দেখতে এসেছিল। গোলমালের সময় অধৈর্য হয়ে বৃদ্ধা কাছের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাগা, বিদ্দেসাগর কই?' লোকটি বলল, 'কেন? এই তো বিদ্দেসাগর।' বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে বৃদ্ধা কপালে হাত দিয়ে বলল, 'হা আমার পোড়াকপাল! এই মোটা ফতুয়া আর চাদর গায়ে, চটি পায়ে উড়ে বেয়ারাটা—এই তোমাদের বিদ্দেসাগর! একে দেখবার জন্যে এতটা পথ হেঁটে এলাম আর রোদে ভাজা ভাজা হলাম! মুখে আগুন অমন বিদ্দেসাগরের! না আছে গাড়ি, না আছে চেন দেওয়া ঘড়ি, না আছে চোগা-চাপকান! এই তোমাদের বিদ্দেসাগর!' বুড়ি গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

বিদ্যাসাগরকে সকলে দয়ার সাগর বলেন। তাঁর দয়া, বদান্যতা, মহানুভবতা ও মানবতা সম্বন্ধে এত গল্প শোনা যায় যা বলে শেষ করা যায় না। কয়েকটি ছোট ছোট গল্প এখানে আমরা বলছি।

১৮৬৭ সালে অনাবৃষ্টির জন্য বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। চারিদিকে হাহাকার ওঠে। একমুঠো অন্নের জন্য মানুষ বাড়ি বাড়ি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনাহারে কত লোকের যে প্রাণ যায় তার ঠিক নেই। এইসময় বিদ্যাসাগর হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় সরকারী ও বে-সরকারী চেষ্টায় দুর্ভিক্ষপিড়ীতদের কষ্ট নানাভাবে দূর করার ব্যবস্থা করেন। নিজে চেষ্টা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে

অনেক জায়গায় অন্নসত্র খোলেন। নিজের গ্রাম বীরসিংহেও একটি অন্নসত্র খোলা হয় এবং সেটি তাঁর নিজের খরচেই চলতে থাকে। প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে অন্নসত্র খুলে তিনি গ্রামের বহুলোকের প্রাণ বাঁচান। এই সময় তাঁর গ্রামের বাড়িতে ১২ জন রাধুনি দিনরাত রান্না করত, এবং ২০ জন লোক অবিশ্রান্ত পরিবেশন করত। প্রথমে ১০০।২০০ জন খেত। তারপর অন্নকষ্ট যত বাড়তে থাকল, তত তাঁর অন্নসত্রের লোকের সংখ্যাও বাড়তে থাকল। সারাদিন সারারাত অন্ন বিতরণ করেও কূল পাওয়া যেত না। গ্রাম থেকে ছোট ভাইবা কেউ চিঠি লিখলে তিনি উত্তরে তাঁদের জানাতেন, 'যত টাকা খবচ হয় হোক, কেউ যেন অ-ভুক্ত না থাকে। সকলেই যেন হু'মুঠো খেতে পায়।' এই সময় কলকাতা থেকে প্রায় তিনি গ্রামের বাড়িতে যেতেন এবং নিজে অন্নসত্রের ব্যবস্থাদি তদারক কবতেন। হাড়ি, ডোম, বাগদী প্রভৃতি গ্রামের উপেক্ষিত লোকদের যাতে কোন অযত্ন না হয়, সেদিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। এইসব শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গায়ে-মাথায় এমনিতেই তেল দিত না। সেইজন্য তাদের রুক্ষ দেখাত। দুর্ভিক্ষের সময় এই হাড়ি-ডোম-বাগদীর ছেলেমেয়েদের রুক্ষ মাথায় ও দেহে বিদ্যাসাগর নিজেব হাতে তেল মাখিয়ে দিতেন। কত লোককে যে এইভাবে তিনি জীবন দান করেছিলেন তার ঠিক নেই। আজও এই অঞ্চলের লোক সেই কথা ভোলেনি।

একবার বর্ধমান থেকে বীরসিংহ বিদ্যাসাগর পাল্কী করে যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় বেয়ারারা বিশ্রামের জন্য পাল্কী নামায়। একটি বালক এই সময় বিদ্যাসাগরের পাল্কীর কাছে এসে বলে, 'একটা পয়সা দেবে বাবু?'

বিদ্যাসাগর—'একটা পয়সায় কি করবি ?'
বালক—'খাবার কিনে খাব।'
বিদ্যাসাগর—'যদি ছুটো পয়সা দিই ?'
বালক—'তাহলে কালকে এক পয়সা খাব।'
বিদ্যাসাগর—'যদি চারটে পয়সা দিই ?'
বালক—'তাহলে খাব না, ব্যবসা করব।'
বিদ্যাসাগর -'চার পয়সায় কি ব্যবসা করবি ?'
বালক—'চার পয়সায় আম কিনে হাটে নিয়ে গিয়ে ছু' আনায় বেচব। লাভের পয়সায় খাব, পরদিন আবার ঐ-রকম কেনা-বেচা করব।'
বিদ্যাসাগর—'বাঃ, তোর তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। নে তোকে আট পয়সা দিচ্ছি। যদি হাটে ঐ-রকম কেনাবেচা করে এই পয়সা বাড়াতে পারিস, তাহলে পনের দিন পরে যখন আবার এই পথ দিয়ে আমি যাব, তখন আমার সঙ্গে দেখা করিস, তোকে একটা দোকান করে দেব।'

পনেরদিন পরে বিদ্যাসাগর যখন ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন সেই ছেলেটি ঠিক তাঁর জন্য পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের পাল্কী দেখে ছুটে এসে সে বলল, 'এই দেখ, তুমি যে আটটা পয়সা দিয়েছিলে তাই দিয়ে একটা টাকা করেছি।' পাল্কী থেকে নেমে বিদ্যাসাগর ছেলেটিকে খুব আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'টাকা যখন চিনেছিস তখন তোর টাকা হবে। এই দশটাকা তোকে দিয়ে গেলাম, এই দিয়ে দোকান করবি, দেখবি পরে তুই খুব বড় দোকানদার হবি।' বাস্তবিক ছেলেটি তাই হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পরের কথা, বিদ্যাসাগর যখন ঐ পথ দিয়েই

একদিন যাচ্ছিলেন তখন একটি যুবক তাঁকে এসে প্রণাম করল। গ্রামে এর মধ্যে তার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অর্থও হয়েছে। প্রণাম করে বিদ্যাসাগরকে সে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

বিদ্যাসাগর—'কেন পারব না? তুই বড় হয়েছিস বলে তোকে চিনতে পারব না? তুই যেমন বড় হয়েছিস, তেমনি তোর দোকানটাও বড় হয়েছে তো?'

যুবক—'আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচ-ছ'টা গ্রামের মধ্যে আমার দোকানের মতো এত বড় মুদির দোকান আর কারো নেই।'

বিদ্যাসাগর তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করছি, তুই আরও বড় হ, তোর দোকান আরও বড় হোক্। এইবার বিয়ে করে সংসার কর।' যুবকটি লজ্জায় মাথা হেঁট করে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলতে লজ্জা হচ্ছিল, আর পাঁচদিন পরে আমার বিয়ে। এই পথ দিয়ে তখন যদি যান তাহলে আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হব।' বিদ্যাসাগর বললেন, 'যদি যাই তাহলে নিশ্চয়ই যাব।' এই কথা বলে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 'এই নে, তোর বিয়ের জন্য দিলাম।' এই কথা বলে তিনি পাল্কী করে চলে গেলেন। যুবকটি পাল্কীর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, আমাদের দেশের লোক সকলে যদি এরকম হত!

একবার চন্দননগরে পথে যেতে তিনি দেখতে পান, একটি পাগল ছেলে শুধু খিল্ খিল্ করে হাসছে। রাস্তার যত সব লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসছে। নিতান্ত একটি বালক, অল্প বয়সেই তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—এ দৃশ্য এমনি-

তেই করুণ। অথচ তাকে ঘিরে লোকজন ভিড় করে হাসি-মস্‌করা করছে, এ তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। তাঁর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে তাঁর এত কষ্ট হল যে তিনি কান্না সংবরণ করতে পারলেন না। লোকজনের সামনেই তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে পাল্কীতে তুলে নিয়ে বাড়িতে এলেন। তারপর চন্দননগর থেকে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে রেখে, নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। সুস্থ হয়ে ছেলেটি তার বাপমার কাছে ফিরে যায়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর মশায়ের খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। শিবনাথ যখন মধ্য-কলকাতায় থাকতেন তখন বিদ্যাসাগর প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতেন। একদিন গিয়ে দেখেন শিবনাথ একটি সাত-আট বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছেন এবং মেয়েটি তাঁকে 'দাদা, দাদা' বলে ডাকছে। মেয়েটি নাপিতের মেয়ে, বালবিধবা। দেখতে খুব সুন্দরী, মনে হয় উঁচু বংশের মেয়ে। বিধবা শুনে বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর প্রতি স্বভাবতই অনুরাগী হলেন। কোলে পিঠে করে মেয়েটিকে আদর করে, খাবার কিনে এনে দিয়ে বললেন, 'তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব, লেখাপড়া শিখবি। তারপর একটা ভাল ছেলে দেখে আবার তোর বিয়ে দিয়ে দেব।' মেয়েটি জানে না, এত আদর করছে যে সে লোকটি কে? শিবনাথকে বিদ্যাসাগর বললেন, 'কালকেই তুমি একটা পাল্কী করে এই মেয়েটি ও তার মাকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিও। আমার মাকে একবার দেখাব মেয়েটিকে। ওর মার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে

দেব, খরচ-খরচা আমার।' পরদিন শিবনাথ মেয়েটি ও তার মাকে একটি পাল্কী করে বিদ্যাসাগরের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। সেখানে বিদ্যাসাগর ও তাঁর মা ভগবতী দেবী তাদের খুব আদর যত্ন করেন। ফিরে এসে শিবনাথের কাছে সেই গল্প তারা করে। সব ঠিক হয়ে যায়, মেয়েটি পড়বে, তার বিয়ে দেওয়া হবে, বিদ্যাসাগর সমস্ত খরচ দেবেন। কিন্তু তারপর ঘটনাচক্রে মেয়েটিকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়, বিদ্যাসাগর মশায়ের ইচ্ছা পূরণ হয় না। একথা বহুদিন তিনি দুঃখ করে শিবনাথের কাছে বলেছেন।

বিদ্যাসাগব মশায় দয়ার সাগর ছিলেন বটে, কিন্তু অ-পাত্রে দয়া ও দান করা তিনি একেবারেই পছন্দ কবতেন না। অবশ্য তাঁর পছন্দ-অপছন্দে বিশেষ কিছু যেত আসত না। যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁবা বিলক্ষণ জানতেন কিভাবে তাঁকে মোচড় দিতে হয়। অপাত্রে সাহায্য ও সহানুভূতির কথা শুনলে তিনি প্রথমে তেলে-বেগুনে রেগে উঠতেন। তারপর দুঃখের কথা জানিয়ে আবও একটু মোচড় দিলে একেবারে নরম হয়ে যেতেন। এরকম বহু ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে, শিবনাথ শাস্ত্রী তার দু' একটি মাত্র উল্লেখ করেছেন।

তখন অল্পবয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ হত। শিবনাথ তাঁর বালিকা-বধূ নিয়ে কলকাতা শহরে আলাদা একটি ছোট বাসা করে থাকতেন। এই সময় তাঁর এক বন্ধু হঠাৎ সস্ত্রীক একদিন তাঁর বাসায় এসে হাজির হন। বন্ধুটি বিধবাবিবাহ করেছিলেন এবং শিবনাথ সেই বিবাহের উদ্‌যোগী ছিলেন। কাজেই শিবনাথের আর্থিক অবস্থা ও বাসার অল্প জায়গায় না কুলোলেও তিনি বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারলেন না। বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী ও তাঁদের একটি শিশুসন্তান,

এই তিনজন তাঁর অতিথি হলেন। কেবল অতিথি সেবার ভার পড়ল যে তা নয়। বন্ধুটি খুব খারাপ অসুখে ভুগছিলেন, তার চিকিৎসারও ভার তাঁকে নিতে হল। অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুর অসুখ কমল না, দিন দিন বাড়তে লাগল। আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই জেনে বন্ধুর ইচ্ছা হল তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করার। এ ইচ্ছা যে সহজে পূরণ হবে না তা তিনি জানতেন। শিবনাথও জানতেন, বন্ধুর স্বভাবচরিত্র ভাল নয় বলে তাঁর বাবা আদৌ তাঁর প্রতি প্রসন্ন নন। কাজেই বন্ধু যখন শিবনাথের কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন, শিবনাথ তখন খুবই অসহায় বোধ করতে থাকেন। কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর অনুরোধে বন্ধুর বাবা কখনও দেখা করতে আসবেন না। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে শিবনাথের মনে হল, বন্ধুর বাবা বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, হয়ত বিদ্যাসাগর মশায়কে অনুরোধ করলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

শিবনাথ এই কথা ভেবে একদিন বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি যান। তাঁর হাবভাব দেখে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন যে শিবনাথ কোন একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে তোমার? মনে হচ্ছে কোন একটা মুশকিলে পড়েছ?' শিবনাথ নিজের পিতার চেয়েও বিদ্যাসাগরকে বেশি ভয় ভক্তি করতেন। ভয়ে ভয়ে তিনি তাঁর বন্ধুর ব্যাপারটা সমস্ত খুলে বললেন। শুনে কোন রকম সাহায্য করা দূরে থাক, বিদ্যাসাগর মশায় হঠাৎ চটে উঠে শিবনাথকে এমন ধমকানি দিলেন যে তিনি প্রায় উঠে পালাবার উপক্রম। তিনি বুঝতেই পারেননি যে বিদ্যাসাগর তাঁর কথায় এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। বিদ্যাসাগর বললেন,

'এরকম একজন অপদার্থ কুলাঙ্গারকে বাড়িতে স্থান দিয়েছ, খেতে দিচ্ছ, তার জন্য একটুও লজ্জা নেই, আবার আমাকে বলতে এসেছ তার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে? যাও, বেরোও এখান থেকে।' হুঁকো হাতে বিদ্যাসাগর প্রায় তেড়ে এলেন। শিবনাথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'বন্ধুর শেষ জীবনের ইচ্ছেটুকু মেটাতে পারলাম না, বড় দুঃখ রয়ে গেল।' এই মোচড়টিতে কাজ হল। শিবনাথ চলে যাচ্ছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন, 'ঠিক আছে, বসো। দুঃখ নিয়ে আর যাবে কেন, দেখি কি করা যায়।' শিবনাথ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

বিদ্যাসাগরের কথা ও কাজ এক। পরদিন সকালেই বন্ধুর বাবা ছেলেকে দেখতে গেলেন। পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হল। বিদ্যাসাগরও শিবনাথের বাসায় তাঁকে দেখতে গেলেন। শিবনাথ ও তাঁর বন্ধুব দুরবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর তাঁর হাতে দশটা টাকা গুজে দিয়ে বললেন, 'একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করো, দেখ বন্ধুর বাচ্চা ছেলেটির যেন কোন কষ্ট হয় না।' শিবনাথ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, যে লোক আগের দিন তাঁর বন্ধুর কথা শুনে তাঁকে প্রায় মারতে এসেছিলেন, সেই লোক পরের দিন তাঁকে ডেকে তারই জন্য অর্থ সাহায্য কবে গেলেন!

একবার বিদ্যাসাগরের এক বন্ধু তাঁর এক ভাইঝির চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন। কিছুদিন থেকে ভাই-ঝিটির মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এবং উপসর্গগুলি ক্রমেই বাড়ছিল। পরিবারের খুব আদরের মেয়ে, চমৎকার স্বভাব, দেখতেও সুশ্রী, বয়সে তরুণ। ভাইঝি না বদ্ধ উন্মাদ

হয়ে যায়, এই দুশ্চিন্তায় বন্ধু কাতর হয়ে পড়েন। কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যাসাগর যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু সাহায্য করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয় না। মেয়েটির খেয়াল হয় যে বিদ্যাসাগর মশায় নিজের হাতে দুবেলা তাকে যদি না খাইয়ে দেন, তাহলে সে কিছু খাবে না। মাথা খারাপ, কাজেই তার খেয়াল জিদে পরিণত হল। এমন অবস্থা হল যে বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মশায় নিজে না খাইয়ে দিলে সে কিছুই খেত না, এমনকি জল পর্যন্ত স্পর্শ করত না। অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। বিদ্যাসাগর মশায়ের কাজ বাড়ল। তার জন্য তিনি একটুও বিরক্ত হলেন না। তখন তাঁকে সারাদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। সমস্ত কাজের মধ্যে তিনি দুবেলা, দুপুরে ও রাতে, ঠিক সময় মতো বন্ধুর বাসায় তাঁর ভাইঝিকে খাওয়াতে যেতেন। এই কাজটিকেও তিনি অন্য কাজের চেয়ে ছোট কাজ বলে মনে করেন নি। তাঁরই সেবা যত্নে মেয়েটি ধীরে ধীরে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে।

কলকাতার বাইরে করমাটাঁড়ে (সাঁওতাল পরগণায়) বিদ্যাসাগরের একটি বাংলো বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নেবার জন্য যেতেন এবং নিশ্চিন্তে বসে লেখার কাজও করতেন। আর তাঁর কাজ ছিল গ্রামের সাঁওতালদের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ শোনা এবং সাধ্যমতো সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও বিদ্যা-সাগর মশায় পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। একবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী করমাটাঁড়ে গিয়ে কয়েকদিন বিদ্যাসাগরের কাছে

থাকেন। তখন তিনি স্বচক্ষে যা দেখেছেন, করমাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্বন্ধে সেকথা লিখে গেছেন। শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন ঃ

"করমাটাঁড়ে বিদ্যাসাগরের ঘরে দেখলাম চারিদিকে ব্রাকেটের উপর তাক, তাকের নিচে একজায়গায় দেখলাম এক হাঁড়া মতিচুর ও এক হাঁড়া ছানাবড়া, বোধ হয় বর্ধমান থেকে আমদানি করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মশায় বারান্দায় পায়চারি করছেন, মধ্যে মধ্যে টেবিলে বসে কথামালা ও বোধোদয়ের প্রুফ দেখছেন। প্রুফে বিস্তর কাটাকুটি করছেন। যেভাবে প্রুফগুলি পড়ে আছে, মনে হল, রাতেও তিনি প্রুফ দেখেছেন। আমি বললাম, 'কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন?' তিনি বললেন, 'জানিস, ভাষাটা এমন জিনিস যে কিছুতেই যেন স্পষ্ট হয় না। সব সময় মনে হয় যেন আরও ভাল শব্দ পেলে আরও ভাল হত। আমি তাই সব সময় কাটাকুটি করি।' আমি ভাবলাম, এই বুড়ো বয়সেও তাঁর বাংলা ইডিয়মের উপর কত নজর!

"রোদ উঠতে-না-উঠতেই দেখলাম একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা নিয়ে উপস্থিত হল। বলল 'ও বিদ্দেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা না হলে ছেলেটার চিকিৎসা হবে না। তুই আমার এই ভুট্টা কটা নিয়ে পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে।' বিদ্যাসাগর মশায় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে ভুট্টা কটা নিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল এল, তার বাজরায় অনেক ভুট্টা। সে বলল যে তার আট গণ্ডা পয়সা দরকার। বিদ্যাসাগর মশায় আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে তার বাজরাটি কিনে নিলেন। আমি

বললাম, 'বাঃ, এ তো বড় আশ্চর্য। খদ্দের দর করে না, যে বেচে সে দর করে।' বিদ্যাসাগর মশায় একটু হাসলেন, কিছু বললেন না। তারপর ভুট্টাগুলি নিজের হাতে তাকে সাজিয়ে রাখলেন। বেলা আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক-গুলো ভরে গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত ভুট্টা নিয়ে আপনি কি করবেন?' তিনি বললেন, 'দেখবি রে দেখবি, কি করি।'

"এরকম ভুট্টা কেনা চলছে, এর মধ্যে দুটো কুড়ি-বাইস বছরের সাঁওতাল মেয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও বিদ্দেসাগর আমাদের কিছু খাবার দে।' তারা উঠোনে ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই রকে উঠল না। আমি বললাম, 'ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া রয়েছে, দু-একটা ওদের দিন না।' তিনি বললেন, 'দূর পাগলা। ওরা কি ওর স্বাদ জানে, না রস জানে? দিলেই টপ টপ্ করে খেয়ে ফেলবে, কি খাচ্ছে-না-খাচ্ছে কিছুই বুঝবে না। ওদের খাবার হলেই হল, ভাল মন্দ ওরা বোঝে না। ওর জন্যে আবার আর এক রকমের লোক আছে। এখান থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে কোরা বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে এক মারাঠা রাজা আছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এইখানে ওরা একটা ছোটখাটো আস্তানা করে। এখনও সেখানে অনেক মারাঠা আছে, ব্রাহ্মণও আছে, অন্য জাতও আছে। কিন্তু সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে ওরা প্রায় সাঁওতালী হয়ে গিয়েছে। ওদের কোন ভাল খাবার দিলে প্রথমে এক কামড় খেয়ে দেখে, পরীক্ষা করে, জিজ্ঞাসা করে কি কি জিনিস দিয়ে তৈরি, কোথা থেকে আনানো হয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারি, এদের জিভ আছে। কিন্তু এই

সাঁওতালদের ওসবের বালাই নেই। ওদের কাছে মুড়ি চিড়েও যা, সন্দেশ রসগোল্লাও তাই।

"আমার কথায় মতিচুর ছানাবড়া দিলেন না দেখে আমি বললাম, 'এক কাজ করি, আমার সঙ্গে কতকগুলো পরশু-ভাজা লুচি আছে, আমি সেগুলো এদের দিয়ে দিই।' তিনি বললেন, 'তোর সঙ্গে লুচি আছে নাকি? কই দেখি।' আমি পোঁটলা খুলে কলাপাতায় বাঁধা দুদিস্তে লুচি বার করলাম। বললাম, 'দুদিন বাঁধা আছে, কলাপাতাগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, লুচিতেও কলাপাতার গন্ধ হয়ে গিয়েছে।' বলেই সেগুলো সাঁওতালনীদের দিতে যাচ্ছি, বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, 'আমায় দে, ওদের কি অমন করে দিতে আছে?' বলে লুচিগুলো নিয়ে কলাপাতা খুলে একটু হাওয়ায় রেখে দিয়ে বললেন, 'এই দেখ, একটুও গন্ধ নেই।' তারপর মাঝখান থেকে চার খানা লুচি নিয়ে বেশ সাবধানে তুলে রাখলেন। আমি বললাম, 'ও কি করছেন?' তিনি বললেন, 'খাব রে খাব। তোর মায়ের হাতে ভাজা?' আমি বললাম, 'না, বড় বৌ-এর।' তিনি বললেন, 'তবে তো আরও ভাল। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবাস্ত্রীর হাতে ভাজা? নন্দ আমার বড় প্রিয় পাত্র ছিল।' তারপর দুখানা লুচি নিয়ে তিনি সাঁওতাল মেয়ে দুটিকে দিলেন। তারা টপ্ করে খেয়ে ফেলল। বিদ্যাসাগর বললেন, 'দেখলি, ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?'

"এদিকে ভুট্টা কেনা ক্রমাগত চলতে লাগল। একটু বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছি, এসে দেখি বিদ্যাসাগর নেই। সমস্ত ঘর খুঁজলাম, কোথাও নেই। রান্নাঘরে নেই, বাগানে নেই, কোথায় গেলেন? খুঁজতে খুঁজতে দেখি, বাগানের পিছন দিকে

একটা দরজা খোলা। বুঝলাম, এখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আলের পথ ধরে বিদ্যাসাগর মশায় হন্ হন্ করে হেঁটে আসছেন, দর্ দর্ করে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। পিছনের দরজায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' আমি বললাম, 'আপনাকে খুঁজছি, কোথায় গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'ওরে শোন্, খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে, সে বললে যে তার ছেলেটার নাক দিয়ে হু-হু করে রক্ত পড়ছে, আমি যদি তাকে বাঁচিয়ে দিই। তাই এই বাটি করে ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা ডোজ ওষুধেই কাজ হল, রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেল।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদূর গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'ঐ যে গাঁটা দেখা যাচ্ছে—কত আর হবে? মাইল দেড়-দুই।' মাঠের আলের উপর দিয়ে দু'মাইল পথ যাওয়া আর আসা যে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে কিছুই নয় তা আমি জানতাম।

"বাংলোয় ফিরে এসে দেখি সামনের উঠোনে সাঁওতালদের ভিড় জমে গেছে, পুরুষ-ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সব রকমের সাঁওতাল আছে। তারা দল বেঁধে বসে আছে, কোন দলে পাঁচজন, কোন দলে আট জন, কোন দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলো শুকনো পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখেই তারা বলে উঠল, 'ও বিদ্দেসাগর, আমাদের খাবার দে।' বিদ্যাসাগরমশায় ভুট্টা পরিবেশন করতে লাগলেন। তারা সেই শুকনো কাঠ ও পাতায় আগুন জ্বেলে ভুট্টা স্যাঁকে আর খায়-ভারী ফুর্তি! আবার চেয়ে নেয়, কেউ দুটো, কেউ তিনটে

কেউ চারটে খেয়ে ফেলল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরিয়ে গেল। সাঁওতালরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'খুব খাইয়েছিস।' বলে চলে গেল। বিদ্যাসাগর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে দেখলি, কি হল?' আমি তাঁর মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম, দেখেছি—এরকম দৃশ্য আর বোধ হয় জীবনে কখনও দেখতে পাব না।"

করমাটাঁড়ে তখন সাত-আটঘর বাঙালী ছিলেন। তাঁরা কেউ মাছ খেতে পেতেন না। বিদ্যাসাগর মশায়ও একসময় মাছ খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, এমন কি দুধ সন্দেশ ঘি-এর জিনিসও খেতেন না। একেবারে গ্রাম্য খাবার, মুড়ি-নারকেল-গুড় এইসব খেতে ভালবাসতেন। করমাটাঁড়ের বাঙালীরা একদিন তাঁকে বললেন, 'আমরা এখানে মাছ খেতে পাই না।' 'কেন' প্রশ্ন করতে তাঁরা বললেন যে জেলেরা নাকি এদিকে আসে না। বিদ্যাসাগর ব্যাপারটা খোঁজ করে জানলেন যে বাবুরা মাছ খেয়ে দাম দেন না বলে জেলেরা মাছ বেচতে আসে না। তারপর থেকে বিদ্যাসাগর মশায় নিজে পয়সা দিয়ে মাছ কিনে নিয়ে বাঙালীদের বাড়ি বাড়ি ভাগ করে পাঠাতেন। এই ব্যবস্থাটা এমন নিয়মিত হয়ে গিয়েছিল যে বাড়ির ছেলেরা সকাল সকাল ভাত খাবার বায়না ধরলে তাদের বলা হত—ঈশ্বর জেলে এখনও মাছ দিয়ে যায়নি, ভাত দেব কি? এ তো গেল মাছের কথা। পুজোর সময় সাঁওতালদের জন্য তিনি তিন-চারশ টাকার কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। বাঙালীদের প্রত্যেকের জন্য কাপড় কিনতেন। কলকাতায় এসে নিজে সমস্ত কেনা-কাটা করতেন।

বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোকজন অসুখবিসুখে কাজ-কর্ম

করতে অক্ষম হলে তিনি সবার আগে খবর নিতেন, তাদের সংসার কেমন করে চলছে। কারও সংসার অচল হলে তিনি কোন-না-কোন উপায়ে তাকে সাহায্য করতেন। একবার বিদ্যাসাগরের জীবনীলেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব অসুস্থ হয়ে কর্মস্থান ছেড়ে অনেকদিনের জন্য বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন। তখন তাঁর বেশ আর্থিক অভাব হয়। বিদ্যাসাগর লোকমুখে এই খবর পেয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে দিয়ে চণ্ডীচরণকে ডেকে পাঠান। সুরেশচন্দ্র অসুস্থ চণ্ডীচরণের কাছে গিয়ে বলেন, 'দাদামশায় বলেছেন যে যদি আপনার চলাফেরা করার শক্তি থাকে তবে তাঁর কাছে একবার যাবেন। তিনি শয্যাগত, তা না হলে নিজেই আপনাকে দেখতে আসতেন।' চণ্ডীচরণ গিয়ে দেখেন বিদ্যা-সাগর মশায় অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁকে বিছানার পাশে এসে বসতে বললেন। তারপর দুজনে যা কথাবার্তা হল তা এই :

বি—'তোমার খুব বেশি অসুখ ?'

চ—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বি -'ছুটি নিয়েছ, বেতন পাও তো ?'

চ—'অর্ধেক পাই।'

বি—'চলে কি করে ?'

চ—'ঋণ করে।'

বি—'মাসে মাসে এরকম কত টাকা ঋণ হচ্ছে ?'

চ—'মাসে প্রায় ৩০।৪০ টাকা।'

বি—'সুদ দিতে হয় ?'

চ—'আজ্ঞে হ্যা, হয়।'

বি—'বলছিলাম কি, এই সময় সুদ দিয়ে টাকা ধার না নিয়ে,

মাসে মাসে কিছু টাকা বিনা সুদে আমার কাছ থেকে নিলে হয় না ?'

চ—'আপনার টাকায় অনেক গরীব-দুঃখীর অন্ন সংস্থান হয়। তাদের বঞ্চিত করে কি আমার টাকা নেওয়া উচিত?'

বি—'তুমি যে বড়লোক তা তো জানতাম না।'

চ—'না না, সেকথা আমি বলি নি।'

বি—'যাই হোক, অনেক দুঃখী আমার পয়সায় খাচ্ছে. তুমিও না হয় কিছু খেলে।'

চ—'আচ্ছা, একেবারে অচল হলে আপনাকে জানাব।'

বি—'অচল আব কাকে বলে? এব পর সাবাড় হয়ে যাবে যে।'

চ—'সাবাড় হবাব আগে আপনাকে বলব।'

বি—'তা হলে খুব সুবিধে হয় কেমন? টাকাটা আব শোধ দিতে হয় না।' এই কথা বলে বিদ্যাসাগব হাসতে লাগলেন। বললেন, 'তা হবে না বাপু, আগেই টাকাটা নিও, সাবাড় হবাব আগেই শোধ কবে যেও।'

চ—'আচ্ছা তাই হবে।'

বি—'তাই হবে-টবে না। বাড়ি গিযে হিসেব করে দেখ, কতটাকা ঘাটতি হচ্ছে। আমাকে জানিও, সেই টাকাটা মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব।'

এর পব আর কিছু বলা যায় না দেখে চণ্ডীচবণ প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

বিদ্যাসাগর মশায় দান করতে কাতর হতেন না, কিন্তু অপাত্রে দান একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কতলোক যে তাঁকে প্রতারণা করেছে তার হিসেব নেই। এসম্বন্ধেও অনেক গল্প শোনা যায়, দু-একটি গল্প আমরা বলছি।

মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজে কত ছাত্র যে বিনা বেতনে পড়ত তা বলা যায় না। সকলেরই যে বিনা বেতনে পড়ার মতো খারাপ অবস্থা ছিল তা নয়, অনেকে তাঁকে ঠকিয়েও মাইনে দিত না। মাতৃহীন ছেলেদের প্রতি বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত দুর্বলতা ছিল। একথা অনেকেই জানতেন। 'মা নেই' বলে কেউ কিছু-তাঁর কাছে এসে চাইলে তিনি কিছু না ভেবেই তাকে তা দিতেন। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এইভাবে অনেকে তাঁর কাছ থেকে বই কেনার টাকা নিয়েছে, বেতন না দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পরে তাদের প্রতারণার কথা জানতে পেরে তিনি যেমন দুঃখিত তেমনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদের বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়েও দিয়েছেন!

কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলের একটি ছাত্র তাঁর কাছে চিঠি লিখে বই কেনার টাকা নিত। ছেলেটি লিখত যে তার মা-বাবা নেই, খুব গরীব, পয়সা খরচ করে কলকাতায় যাবার ক্ষমতা নেই। তাই সে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছে না। বিদ্যাসাগর তাকে ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। প্রত্যেক বছর সে লিখত, পরীক্ষায় ভাল করে পাস করে ক্লাশে উঠেছি, বই কেনার টাকা পাঠিয়ে দেবেন। বিদ্যাসাগর টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবে প্রায় তিন বছর কেটে যাবার পর সেই স্কুলের এক শিক্ষকের সঙ্গে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের দেখা হয়। তিনি ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং খোঁজ করতে বলেন। খোঁজ করে শিক্ষক জানান যে ঐ নামে কোন ছেলে তাঁদের স্কুলে পড়ে না। ব্যাপারটা তখন বিদ্যাসাগর পরিষ্কার বুঝতে পারেন। কোন বদমায়েস লোক ছেলেটিকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে, গরীব ছাত্রদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

ছাত্রদের প্রতি বিদ্যাসাগরের মনোভাব ছিল অত্যন্ত আধুনিক, একালের শিক্ষকরাও বোধহয় অতটা আধুনিক এখনও হতে পারেননি। বেত মেরে, বকুনি বা শাস্তি দিয়ে ছাত্রদের ভাল করা যায়, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না, ছাত্রদের কোনরকম দৈহিক দণ্ড দেওয়া- যেমন বেত মারা- অর্থবা অন্য ছাত্রদের সামনে অপমান করা—যেমন বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কানমলে দেওয়া ইত্যাদি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন মধ্যে মধ্যে ঘুরে দেখে যেতেন ক্লাসে কি হচ্ছে না হচ্ছে। চেহারা রোগা ছিল বটে, কিন্তু গলার আওয়াজ ছিল গম্ভীব, প্রকৃতি ছিল তার চেয়েও গম্ভীর, দেখলে ভয় লাগে, ছেলেরা কেউ সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না। যতবড় দুরন্ত ছেলেই হোক, তাঁর সামনে দাঁড়ালে কথা বলতে পারত না, তোত্‌লা হয়ে যেত। কলেজে যখন খুব গণ্ডগোল হত, তখন তিনি বাইরের বাবান্দায় এসে 'আস্তে' বলে এমন একটা আওয়াজ করতেন যাতে সমস্ত কলেজ এক মুহূর্তে এমন নিস্তব্ধ হয়ে যেত যে আলপিন পড়লেও শোনা যায়। ছাত্রে-ছাত্রে ঝগড়া হলে তিনি কারও পক্ষ নিতেন না। কেউ নালিশ করতে এলে বলতেন, 'হেরে গিয়ে নালিশ করতে এসেছিস, লজ্জা করে না ? যা বেরিয়ে যা।' বেশি ঝগড়া হলে দুজনকেই কলেজ থেকে বার করে দিতেন, তবু বিচারক হতেন না। যারা খুব গরীব ছাত্র তাদের টিফিনের সময় নিজের ঘরে ডেকে যা-হোক কিছু জলখাবার খেতে দিতেন।

একদিন কলেজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি দেখতে পান, একজন পণ্ডিতমশায় ক্লাসের ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। দেখে তৎক্ষণাৎ পণ্ডিত মশায়কে বাইরে ডেকে পাঠিয়ে আড়ালে

(যাতে ছাত্ররা না শুনতে পায়) জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি যাত্রার দল খুলেছেন নাকি ? মনে হচ্ছে ছাত্রদের সখী সাজিয়ে তালিম দেবেন ?' পণ্ডিতমশায় অপ্রস্তুত হয়ে যান। ছাত্ররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ে।

আর একদিন বিদ্যাসাগর মহশায় দেখতে পান এক পণ্ডিত মশায়ের টেবিলের উপর একগাছা বেত রয়েছে। পণ্ডিতমশায়কে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'বেত কেন পণ্ডিতমশায় ?' পণ্ডিত জানতেন যে বিদ্যাসাগর এসব পছন্দ করেন না। মাথা চুলকে তিনি বললেন, 'ম্যাপ দেখাবার সুবিধে হয় তাই।' বিদ্যাসাগর বললেন, 'ও তাই বুঝি। হুঁ—বথ দেখাও হয়, কলা বেচাও হয়—অর্থাৎ বোর্ডে ম্যাপ দেখানোও হয়, আবার ছাত্রদের পিঠেও পড়ে।' তারপর থেকে সেই পণ্ডিতমশায় আর বেত নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন না।

একদিস দুপুর বেলা তিনি খেতে বসেছেন, এমন সময় একজন এসে তাঁকে খবর দেয় যে, তাঁর মেট্রোপলিটন স্কুলের এক শিক্ষক একটি ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, এবং তাই নিয়ে ক্লাসে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। তাঁর খাওয়া তখনও পুরো হয়নি। খাবার ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। হাতমুখে একটু জল দিয়ে, চটি পায়ে দিয়ে হন্ হন্ করে হাটতে আরম্ভ করলেন স্কুলের দিকে। গায়ে জামা দবারও সময় পাননি, শুধু চাদরটা জড়িয়ে নিয়েছিলেন অসম্ভব রেগে গিয়েছিলেন। রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকত না। স্কুলে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তিনি সেই শিক্ষককে ডেকে পাঠান। বেঞ্চের উপর তাঁর স্কুলের ছাত্রদের দাঁড় করানো নিষেধ আছে, তা সত্ত্বেও কেন তিনি ছাত্রদের ঐভাবে অপমান-কর শাস্তি দিয়েছেন তার কৈফিয়ৎ চান। শিক্ষক কোন উত্তর

দেন না। বিদ্যাসাগর তখনই তাঁকে পদচ্যুতির পত্র দিয়ে বলেন, এখনই স্কুল থেকে চলে যান। অন্যান্য শিক্ষকরা অনেক কাকুতিমিনতি করে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি কারও কথা শুনতে চান না। শিক্ষকরা অনেকে পদত্যাগ করবেন বলেন। বিদ্যাসাগর বলেন, 'আপনাদের যাঁর ইচ্ছা পদত্যাগ করে চলে যেতে পারেন। যদি আমার ক্ষমতা থাকে তাহলে স্কুল চালাব, যদি না চলে তাতেও ক্ষতি নেই, তবু স্কুলের ভেতরে—অন্তত আমার স্কুলে—ছাত্রদের প্রতি এরকম অসভ্য আচরণ করা চলবে না।' এই কথা বলে বিদ্যাসাগর সোজা আবার হন্ হন্ করে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন। শিক্ষকরা অবশ্য কেউ পদত্যাগ করেন নি, তবে তাঁবা বুঝেছিলেন যে ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর মতামত মান্য না করে তাঁর স্কুলে শিক্ষকতা করা সম্ভব নয়।

একবার মেডিকাল কলেজের বাংলাবিভাগের (পরে ক্যাম্বেল স্কুল) ছাত্রদের তখনকার ইংরেজ অধ্যক্ষ খুব খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করেন। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন মেডিকাল কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য ছাত্ররা অধ্যক্ষের এই অভদ্র আচরণেব প্রতিবাদ করে কলেজে যাওয়া বন্ধ করেন। গোলদীঘিতে ছাত্ররা সভা করে প্রতিজ্ঞা করে যে অধ্যক্ষ যদি তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য ছাত্রদের কাছে দুঃখ প্রকাশ না করেন তাহলে তারা কলেজে যাবে না। অধিকাংশ ছাত্রকেই কলেজের মাসিক বৃত্তিতে খেয়েপরে থাকতে হত। অধ্যক্ষ কিছুতেই নিজের দোষ স্বীকার করে মিটমাট করতে রাজী হলেন না। এদিকে ছাত্রদের প্রায় অনাহারে থাকতে হয়, এরকম অবস্থা হল। কোন উপায় না দেখে তারা শেষ পর্যন্ত ঠিক করল বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে

গিয়ে তাদের দাবী জানাবে। বিদ্যাসাগর আগেই এই ঘটনার কথা শুনেছিলেন। ছাত্রদের মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা আরও ভাল করে তিনি শুনলেন। বুঝতে পারলেন, ইংরেজ অধ্যক্ষের উদ্ধত মেরুদণ্ড একটু নোয়াতে না পারলে ছাত্রদের কলেজে যেতে কিছুতেই রাজী করানো যাবে না। অবশেষে তিনি ছোটলাটের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা বললেন এবং একটা মিটমাট করে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগরের কথা ছোটলাট ফেলতে পারলেন না। অধ্যক্ষকে ডেকে পাঠিয়ে ছোটলাট ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটমাট করে নিতে বললেন। মিটমাট হয়ে গেল, ছাত্ররা আবার কলেজে যেতে আরম্ভ করল। এরমধ্যে বৃত্তির অভাবে ছাত্ররা যখন প্রায় অনাহারে ছিল, তখন বিদ্যাসাগর মশায় তাদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করতেন।

বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ছিল বই ও তাঁর নিজের লাইব্রেরি। বই কেনাতে তাঁর কোন কার্পণ্য ছিল না। ভাল বই এলে থ্যাকার স্পিঙ্কের মতো পুস্তক-ব্যবসায়ীরা তাঁকে খবর দিতেন, তিনি নিজে এসে বই দেখে কিনে নিয়ে যেতেন। দুষ্প্রাপ্য বইও নানা জায়গা থেকে যোগাড় করতেন। বই তাঁর কাছে এত প্রিয় ছিল যে বিলেত থেকে, প্যারিস থেকে, তিনি বহু টাকা খরচ করে বই বাঁধিয়ে নিয়ে আসতেন। বইয়ের দামের চেয়ে বই বাঁধানোর খরচ বেশি পড়ত। একদিন তাঁর এক পরিচিত বড়লোক জমিদার তাঁর লাইব্রেরিতে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় একখানি বাঁধানো বই তাঁর চোখে পড়তে তিনি অবাক হয়ে যান। বইখানি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'চমৎকার বাঁধানো, কোথাথেকে বাঁধালেন? নিশ্চয় অনেক খরচ পড়েছে?'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'হ্যাঁ, এটা মরক্কো চামড়া দিয়ে বিলেত থেকে বাঁধিয়ে এনেছি, বাঁধাই খরচ দশ টাকা পড়েছে' (আজকাল হয়ত পঞ্চাশ টাকা পড়বে)। জমিদারবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বইটা বাঁধাতেই যখন দশ টাকা লেগেছে, তখন বইখানার দাম কত?' বিদ্যাসাগর বললেন, 'বইখানাব দাম পাঁচ টাকা'। জমিদারবাবু চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, অনেকে বলে আপনার একটু পাগলামি আছে, এখন দেখছি কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একখানা বই বাঁধাতেই খরচ কবলেন দশ টাকা, অথচ বইখানার দাম মোটে পাঁচ টাকা।' বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অন্য কথা বলতে লাগলেন। তাবপর ঘবেব মেঝে থেকে এক টুকরো মোটা দড়ি কুড়িয়ে নিয়ে জমিদাববাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বলুন তো, এই দড়িটাব দাম কত হতে পাবে?' জমিদাববাবু বললেন, 'কত আব হবে, একটুকবো দড়ি বৈ তো কিছু নয়।' বিদ্যাসাগব বললেন, 'ধরুন চাব পযসা দাম। আচ্ছা বেশ, এখন বলুন, আপনার ঐ ঘড়িব সোনাব চেনটার দাম কত? অন্তত পাঁচশো টাকা? ঘড়িটাতো এই দড়ি দিয়েও বেঁধে রাখতে পাবতেন? তাহলে যে কাজ চার পয়সায় হয়ে যেত, তার জন্যে পাঁচশো টাকা খবচ কবেছেন কেন? তাহলে বেশি পাগল কে?' জমিদারবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক, তবে ওটা আমাব সখ।' বিদ্যাসাগব বললেন, 'এমনি এটাও আমার সখ। আমি এক টাকার বদলে দশ টাকা খবচ করেছি, আপনি চার পয়সার বদলে পাঁচশো টাকা খবচ করেছেন। কাজেই সখের ব্যাপারে কে বেশি পাগল বুঝতেই পারছেন।'

বিদ্যাসাগর বাইরে যেমন গম্ভীর ছিলেন, ভিতরে, ছিলেন তেমনি রসিক। ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাসে তাঁর সমকক্ষ তখন কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়ের কথা। তখন তাঁর প্রিয় বন্ধু একজন বারাসতে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সেখানে বেড়াতে যেতেন। একদিন বন্ধুর ঘরে বসে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় দেখেন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেশ জোরে জোরে হেঁটে আসছেন তাঁর বন্ধুর বাড়ির দিকে। গোঁড়া টুলোপণ্ডিতদের বিদ্যাসাগর দুচোখে দেখতে পারতেন না। পণ্ডিতএসে সোজা ঘরে ঢুকে বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুর দিকে কটমটিয়ে চেয়ে দেখলেন এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি চিনতেন না। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে তিনি খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন,রাগে গর্ গর্ করছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধুর দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'দুপাতা ইংরেজী শিখে দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল, আর ব্রাহ্মণদেরও এখন সে তেজ নেই, তা না হলে বিদ্যেসাগরের আন্দোলন করা বেরিয়ে যেত। (নিজেব পৈতেয় হাত দিয়ে) জানেন মশায়, এই ব্রাহ্মণের তেজ একদিন এমন ছিল যে তাদের মুখের কথায় আগুন ছুটতো, অভিশাপ দিয়ে তারা ভস্ম করতে পারত—।' এই পর্যন্ত বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাগে কাঁপতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর মশায় আর থাকতে না পেরে বললেন—

'ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়! সেকালের ব্রাহ্মণকে একালেই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি— '

'বিদ্রূপ করছেন ?'

'আজ্ঞে না, অত সাহস নেই। এত তাড়াতাড়ি ভস্ম হতে চাই না—'

'তবে কি বলতে চান আপনি ?'

'আজ্ঞে আপনি যে সেকালের ব্রাহ্মণ তা আপনাকে দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

'কি রকম, কি রকম !'

'আজ্ঞে আপনি যখন আসছিলেন তখন দূর থেকে আপনাকে দেখেই আমার গা জ্বালা কবছিল। বুঝতে পেরেছিলাম খাঁটি সেকালের ব্রাহ্মণ, যেন একটা আগুনের গোলা এগিয়ে আসছে। আপনাব চেহাবা দেখে এমন গা জ্বালা কবছিল যে আমি ঘর থেকে উঠেই যেতাম, নেহাত আমাব বন্ধুর অনুরোধে বসে রইলাম।'

কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তা বুঝতে পারেননি। 'বিদ্দেসাররেব চ্যালা-ট্যালা হবে' বলে বিরক্তিতে তিনি প্রস্থান করলেন।

প্রতিদিন সকালে ক্যাশবাক্সটি নিয়ে বিদ্যাসাগব নিজের বাড়ির বাইবের ঘরে বসতেন। নানা রকমেব লোক তাঁব কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে আসত। একবার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নোংরা ময়লা কাপড় জামা পরে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসেন। এসে বলেন, 'দেখুন, আমার বড় দুরাবস্থা, যদি কিছু সাহায্য করেন খুব উপকার হয়।' বিদ্যাসাগর মুখ তুলে তাঁব দিকে চেয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি একজন পণ্ডিত মশায় ?' 'আজ্ঞে হ্যা' ব্রাহ্মণ বললেন। বিদ্যাসাগর বললেন, 'আপনি কি যেন বলছিলেন, আর একবার বলুন।' ব্রাহ্মণ বললেন, 'আজ্ঞে বড় দুরাবস্থা কি আর বলব।' বিদ্যাসাগর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ বুঝতেই পারছি। আ-কার পাল্টে আসবেন।' ব্রাহ্মণ বললেন, 'আজ্ঞে কি বললেন ?' 'বলছি আ-কার পাল্টে আসবেন।'

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। ভাবলেন, তাঁর ময়লা কাপড়, আর দাড়ি দেখে বিদ্যাসাগর হয়ত চটে গিয়েছেন, তাই আকার পাল্টে যেতে বলেছেন। পরদিন পরিষ্কার কাপড় জামা পরে, দাড়ি কামিয়ে, ব্রাহ্মণ আবার বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে যান। গিয়ে বলেন, 'এই দেখুন আকার পাল্টে এসেছি। এবারে কিছু সাহায্য করুণ, আমার বড় **দুরাবস্থা**।' উত্তর না দিয়ে বিদ্যাসাগর চুপ করে বসে রইলেন। বারংবার তাঁর কানে আসতে লাগল 'বড় দুরাবস্থা, কিছু সাহায্য করুন।' বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, 'আপনাকে বললাম আ-কার পাল্টে আসতে, কেন ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন।' ব্রাহ্মণ কিছুই বুঝতে পারলেন না, আবার ফিরে এলেন। দু-একজন পরিচিত পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হতে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁদের জানালেন। শুনে তাঁরা বললেন, 'উনি তো ঠিকই বলেছেন। আপনি একজন পণ্ডিত মশায়, ওঁর সামনে গিয়ে দুরাবস্থা দুরাবস্থা বলছিলেন কেন? আ-কার হবে না, বলবেন **দুরবস্থা**।' ব্রাহ্মণের চৈতন্য হল, তিনি লজ্জিতও হলেন। তারপর দিন গিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'আমার ভুল হয়েছে। সত্যিই বড় দুরবস্থা, আমাকে কিছু সাহায্য করুন।' বিদ্যাসাগর তাঁকে পাঁচটি টাকা দিলেন।

বিদ্যাসাগর তালতলার চটি পরতেন। তাঁর এই চটি নিয়ে অনেক গল্প আছে। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ কোন প্রয়োজনে তাঁকে একবার দেখা করতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর দেখা করতে যান এবং অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে দেখেন যে তিনি বুটজুতো সুদ্ধু টেবিলের উপর পা তুলে,

চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখে পাইপ টানছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে অধ্যক্ষমশায় তাঁকে হাত ইশারা করে চেয়ারে বসতে বললেন, কিন্তু টেবিল থেকে পা নামালেন না। বিদ্যাসাগরকে বাধ্য হয়ে সাহেবের বুটওয়ালা পা-জোড়ার সামনে চেয়ারে বসতে হল এবং তাঁর যা বক্তব্য ছিল তাও ধৈর্য্য ধরে শুনতে হল। কথা শেষ হবার পর বিদ্যাসাগর গম্ভীর হয়ে উঠে এলেন। কিছুদিন পরে একটি বিশেষ আমন্ত্রণে ইংবেজ অধ্যক্ষকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মশায়েব কাছে আসতে হল। ঘবে ঢুকে সাহেব দেখলেন, বিদ্যাসাগব টেবিলেব উপর চটি-শুদ্ধ দু'খানি পা তুলে দিয়ে চেযাবে বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন। সাহেব ঘবে ঢুকতে তিনি হাত ইশারা করে টেবিলেব সামনে একটা চেয়ারে বসতে বললেন এবং টেবিলের উপর পায়েব চটি জোড়া নাড়তে নাড়তেই কথাবার্তা শেষ কবলেন। সাহেব বেগে টং হয়ে ঘব থেকে বেবিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রেসিডেন্সি কলেজেব অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগবেব আচরণেব বিরুদ্ধে শিক্ষা কৌন্সিলেব সেক্রেটারির কাছে অভিযোগ কবেন। অভিযোগেব বিষয়টি দেখে সেক্রেটাবিও খুব বিস্মিত হন এবং বিদ্যাসাগবেব কাছে চিঠি লিখে ব্যাপারটা কি হয়েছে জানতে চান। চিঠিব উত্তবে বিদ্যাসাগব যা জানান তাব মর্ম এই ঃ 'আমি জানতাম যে আমরা এদেশী নেটিব, অসভ্য অশিক্ষিত, ভদ্রতা-ভব্যতা কিছুই জানি না। ইংবেজ অধ্যক্ষেব সঙ্গে প্রথমে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং তাঁব কাছ থেকেই এই আচবণ শিখে এসেছি। আমি ভেবেছি এরকম জুতো-সুদ্ধ টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে কথা বলাই বোধহয় বিশিষ্ট ভদ্রতা। আমাব পক্ষে ভাবা খুব স্বাভাবিক, কারণ আমি একজন এদেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আধুনিক

ইউরোপীয় ভদ্রতার কিছুই জানি না। কাজেই আমি ভাবলাম যে একজন সুসভ্য সুবিদ্বান ইংরেজ যখন এরকম আচরণ করলেন, তখন তার প্রতিদান আমারও দেওয়া উচিত। আমি আমাদের এদেশীয় ভদ্রতা তাঁকে দেখাইনি, বরং তাঁকেই অনুকরণ করে আরও অনেক উন্নত পাশ্চাত্ত্য ভদ্রতা দেখিয়েছি। এ ব্যাপারে এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই। আশা করি এর থেকেই ঘটনাটির আগাগোড়া কি হয়েছে তা আপনি বুঝতে পারবেন।'

বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। বিদ্যাসাগরের নির্মম শ্লেষ ও বিদ্রূপ ইংরেজ হিসেবে তাঁর গায়েও বিঁধলো। ব্যাপারটি নিয়ে আর তিনি ঘাঁটাঘাটি করলেন না।

বিদ্যাসাগরের চটি সম্বন্ধে এই গল্পটির কথা অনেকেই জানেন। এ ছাড়াও আর একটি ভাল গল্প আছে। ১৮৭৪ সালের ঘটনা। কাশীর এক পণ্ডিতের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একদিন কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি দেখতে যান। তাঁর পরণে ধুতি চাদর আর পায়ে চটিজুতো ছিল। কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতেই তখন মিউজিয়ম ছিল। ভিতরে প্রবেশ করার সময় দরোয়ান তাঁকে চটি খুলে রাখতে অথবা হাতে নিয়ে যেতে বলে। বিদ্যাসাগর কোন কথা না বলে বাড়ি ফিরে আসেন। মিউজিউয়মের ট্রাস্টবোর্ডের সেক্রেটারি তখন ব্লানফোর্ড। তাঁর কাছে বিদ্যাসাগর চিঠি লেখেন এই মর্মে : 'সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম, এদেশী লোক যাঁরা দেশী জুতো বা চটি পরে গেছেন তাঁদের চটি খুলে হাতে করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে—আর যাঁরা চোগাচাপকান পরে বিলেতি জুতো পায়ে

দিয়ে' গেছেন তাঁদের জুতো পরেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানে জুতোর ব্যাপারে এই অধিকারেব পার্থক্য কেন বুঝতে পারলাম না।' তখনকার ইংলিশম্যান, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকায় The Great Shoe Question বলে এই বিষয় নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়।

বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন : 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নেই, প্রয়োজন হলে যার নাকে এই চটি জুতো সুদ্ধ পায়ে টক্ করে লাথি না মারতে পারি।' শিবনাথ শাস্ত্রী এই কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন : "আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্যের মধ্যে।" বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই তেজ ও মাধুর্যের কথা মনে হলে আজকের দিনে যেন ভাবা যায় না যে তিনি বাঙালী ছিলেন। অথচ এই বাংলাদেশের একটি অতি সাধাবণ গৃহস্থ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করে, সারা ভারতে ও পৃথিবীতে উদার ও বলিষ্ঠ মানুষের প্রতিমূর্তি হিসেবে 'বিদ্যাসাগর' নামে পরিচিত হয়েছিলেন, একথা আজ বাংলার ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে স্মরণ করা কর্তব্য।

———